স্বরাজের পথে

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

বৈশাখ, ১৩৩০

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস্

চন্দননগর

সূচী

স্বরাজের পথে

যুগের কথা

আজকালকার যুগের মস্ত কথা হইতেছে সাম্য, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য। এই কথাটাই নানা ক্ষেত্রে নানা রূপে নানা নামে জগতের সমস্ত আলোড়ন বিলোড়নের কলহ কোলাহলের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। Self-determination শব্দটি আজ যথাতথা মুখরিত হইতেছে। Sein Fein বল, 'স্বদেশী'ই বল, অর্থ ঐ একই। Socialism, Syndicalism, Sovietism এমন কি "Suffragettism" পর্য্যন্ত ঐ একই 'স' অথবা 'স্ব' এর মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ব্যষ্টি হউক আর গোষ্ঠী হউক, কেহ আর অপরের কথায় উঠিতে বসিতে চাহিতেছে না, সকলেই চাহিতেছে নিজের ভার নিজে লইতে। মুক্ত ভাবে নিজের পথ নিজে করিয়া লইতে, নিজের সত্য নিজে খুঁজিয়া জানিয়া লইতে, নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে করিয়া লইতে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, অধিকার ত

আছেই তা ছাড়া এইটাই কর্ত্তব্য। মানুষের শক্তি এই পথে, মানবজাতির শান্তিও এই পথে—জীবনের সার্থকতার জন্ম নান্যঃ পন্থা।

একটা যুগ ছিল যখন কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হওয়াটাই সমাজের ছিল নিয়ম ও আদর্শ। তখন কর্ত্তা হইবার অধিকার সকলেরই ছিল না, কারণ সকলেরই সে রকম বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য আছে বা থাকিতে পারে তাহা মানা হইত না। স্বভাবের দোহাই দিয়াই হউক অথবা কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া হউক বলা হইত, মানুষের মধ্যে আছে উত্তম ও অধমের শ্রেণী বিভাগ। উত্তমের কথা অনুসারে চলায় অধমের কল্যাণ। অধম নিজের ভাল নিজে বুঝিতে পারে না, সেই অনুসারে নিজে নিজে চলিবার ক্ষমতাও তাহার নাই; তাই উত্তম তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন, পদে পদে ঠেলিয়া লইবেন। আর এই রকমে সমাজেরও হয় সুশৃঙ্খলা। সকলেই যদি স্ব স্ব প্রধান হয়, তবে গোলমালের ত অবধি থাকিবে না; নিজের জন্য নিজে নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া মারামারি কাটাকাটি হইবে, সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে, তখন 'নিজ' বলিতে কোন মানুষই থাকিবে না। তাই শ্রেষ্ঠ, গুরুজন ও শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে। সমাজের কর্ত্তাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

সমাজের নানা ক্ষেত্রে এই রকম নানা কর্ত্তা পূর্ব্বকালে উঠিয়াছিলেন। সমষ্টিগত জীবনে আগে আমাদের দেশে ছিলেন ব্রাহ্মণ, ইউরোপে ছিল Church—ব্রাহ্মণে ও শূদ্রে, Church-

man ও Lay-manএ কি রকম সম্বন্ধ ছিল, ইতিহাসে সে কথাটা খুব স্পষ্ট করিয়া ফলাইয়াই লেখা আছে। তারপর আর এক কর্ত্তা ছিলেন রাজা—benevolent (আজকালকার ভাষায় বলিব non-violent) despotism হউক আর violent despotism হউক রাজাই ছিলেন প্রজার মালিক বা অধিকারী, রাজাই প্রজার ভালমন্দ নির্দ্ধারণ করিতেন, রাজারই ছিল প্রজার দোষগুণের সব দায়িত্ব, প্রজার নিজস্ব সত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। পারিবারিক জীবনে, যিনি ছিলেন কর্ত্তা (Pater familias) তাঁহার প্রভাব, অধিকার, ক্ষমতার ত এক রকম অবধিই ছিল না। সন্তান ছিল পিতার জিনিষ, পিতার প্রীত্যর্থে সব করা, পিতৃপুরুষদিগকে সন্তুষ্ট করাই ছিল সন্তানসন্ততিদের একমাত্র ধর্ম্ম। পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান ত দূরের কথা, পিতার মনের কথা আগে হইতেই জানিয়া যে সেই অনুসারে চলিতে না পারে সে ত কুসন্তান, মহাপাতকী। তারপর স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সে কথা বিশেষ বলাই বাহুল্য। স্ত্রী আপন অস্তিত্বকে ডুবাইয়া জলাঞ্জলি দিয়া কি রকমে স্বামীর কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছেন তাহার নিদর্শন বাংলা দেশে ভারতীয় সমাজে বেশী খুঁজিয়া পাইতে হয় না। তারপর আর এক কর্ত্তা হইতেছেন গুরু, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যে রকম এক সময়ে ছিল ও এখনও আছে তাহা দেখিয়া বুঝা কষ্টকর শিষ্য একটি সজীব মানুষ, না জড় পদার্থ মাত্র।

এই ত গেল পুরাতন কালের কথা—নূতন কালেও যে এই সব জিনিষের চিহ্ন লোপ পাইয়াছে তাহা নয়, তবে ইহাদের জোর

অনেক কমিয়া গিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পুরাতন কালের কর্ত্তার দল ছাড়া, নূতন কালে নূতন যে কর্ত্তার দল উঠিয়াছে বা উঠিতেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। রাজার কর্ত্তৃত্ব আজকালকার যুগে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে আসিয়াছে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব। পুরাতন কালেও রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব যে একেবারেই ছিল না তা নয়—গ্রীসে, স্পার্টায়, রোমের ইতিহাসে ইহার পরিচয় খুবই পাই; কিন্তু তবুও বিশেষভাবে এটি হইতেছে আধুনিক যুগের কথা। আজকাল প্রত্যেক দেশবাসীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, শুধু শিক্ষা দেওয়া নয়, কাজে কর্ম্মে লাগাইয়া জোর করিয়া প্রমাণ করা হইতেছে যে রাষ্ট্র-রূপ যন্ত্রের সে একটা অঙ্গ মাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন সাধনা হইতেছে এই যন্ত্রটাকে ভাল করিয়া চালান, ইহার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য তাহার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করা। দেশ অর্থাৎ দেশ-শক্তির কেন্দ্র বা প্রতিনিধি যে রাষ্ট্রশক্তি তাহাই ঠিক করিয়া দিবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ও কর্ম্ম, সেইটুকুই সে করিবে, তাহা না করিলে বা তাহা ছাড়া নিজের ইচ্ছামত কিছু করিলে সে হইবে এনার্কিষ্ট—আইন-ভঙ্গকারী, তাহার স্থান ফাঁসীকাঠে, জেলে। রাষ্ট্র যে কেবল নিজের লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে তাহা নয়, পরের রাজ্যের উপরও যথাসাধ্য সে কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে চেষ্টা করিতেছে। আগেও অবশ্য এক রাজ্য আর এক রাজ্যকে অধিকার করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিত, এজন্য যুদ্ধ বিগ্রহও হইত যথেষ্ট, সমস্ত ইতিহাসের অর্থই বোধ হয় ত এই

ব্যাপার। কিন্তু তখন কথাটা ছিল খুব স্পষ্ট, যে খাইতে চাহিত সে খোলাখুলি বলিত আমি তোমাকে খাইব। কিন্তু আধুনিক যুগে ঠিক সে রকমটি হয় না—আধুনিক যুগে যে খাইতে চায় সে বলে তোমাকে খাইব না, তোমাকে civilise করিব, আলোকে আনয়ন করিব। ইউরোপের সাদা রাষ্ট্র সব এসিয়ার আফ্রিকার কালো রাষ্ট্র সবকে এই কথা বলিতেছে। Mandatory নেশন সব অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল লোকদিগকে বলিতেছে, তোমরা শিশু তোমাদের ভার আমরা লইলাম, আমাদের স্বার্থ নাই, জগতের মানবজাতির উন্নতিকল্পে তোমাদের শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে, আমাদের কথা অনুসারে চলিতে মূর্খের মত ইতস্ততঃ করিও না।

তারপর আর এক কর্ত্তা হইতেছেন 'বড় লোক' অর্থাৎ টাকাওয়ালা। অর্থ যাঁহার যত তাঁহার যে মান সম্ভ্রম শুধু তত তা নয়, তাঁহার ক্ষমতাও তত। তিনি যে শুধু ভাঙ্গিতে গড়িতে পারেন তা নয়, কি রকমে ভাঙ্গিতে হইবে আর কি রকমে গড়িতে হইবে সে জ্ঞান বুদ্ধিও তাঁহারই আছে। দেশে দেশে যে যুদ্ধ বা সন্ধি হয়, তা অনেকখানি ধনকুবেরদেরই সুবিধা অসুবিধা অনুসারে। মাল আমদানী রপ্তানি সরবরাহ হয় তাঁহাদেরই প্রয়োজন বুঝিয়া; জিনিষ তৈয়ারী হয়, ফ্যাসানের প্রচলন হয় তাঁহাদেরই রুচি পরিতৃপ্তির জন্য। গরীব লোকেরা নিজেদের সুখ সুবিধা মত জীবন যাপন করিতে পারে না, তাহাদের সুখ সুবিধা বড় লোকেরা বাছিয়া বুঝিয়া দেন। সমাজের যে একটা high tone থাকা দরকার

সেটা বড়লোকেরাই বজায় রাখেন ও রাখিতে পারেন—ছোট লোকের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতেছে 'কাঠ কাটা আর জল টানা' (hewers of wood and drawers of water.)।

আধুনিক কর্ত্তাদের লিষ্ট অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, যদি আর এক রকম শ্রেণীর কথা আমরা উল্লেখ না করি। সে শ্রেণী হইতেছে মুনিব বা হুজুরদের। মুনিব আর চাকুরে হুজুর আর মজুর এ সম্বন্ধটা বিশেষভাবে বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার। আজকালকার নীতিশাস্ত্রে একটা নূতন পাপের জন্ম হইয়াছে দেখা যায়, তার নাম insubordination—চাকুরে যদি মনিবের মন জোগাইয়া না চলে, মজুর যদি সর্ব্বতোভাবে হুজুরের আজ্ঞাকারী না হইয়া থাকে তবে সেটা দোষের (crime) শুধু নয়, সেটা হইতেছে পাপ (sin)। কথাটা অতিশয়োক্তি হইল কি ? অন্ততঃ ভারতবর্ষে যে নয়, তার প্রমাণ আমরা অনেকেই নিজের নিজের ভিতরে ভাল করিয়া তল্লাস করিলে নিশ্চয়ই পাইব জোর করিয়া বলিতে পারি। দাস প্রথা (serfdom) আগেও ছিল। কিন্তু একটু আগেই যেমন আমরা আর একটা জিনিষের সম্বন্ধে বলিয়াছি, পুরাকালে জিনিষটা ছিল খোলাখুলি, সেখানে কোন লুকোচুরি কোন দ্ব্যর্থ ছিল না, সেটা ছিল খুব শরীরগত ব্যাপার, তারপর তখনকার দিনেও মুক্তির অবকাশও সম্ভাবনা ছিল—ছিল যেমন অন্ততঃ Saturnalia, ছিল Ransom, কিন্তু বর্ত্তমানের দাসত্ব একেবারে জমাট নিরেট একটুও ফাঁক কোথাও নাই। তারপর এ জিনিষটা ততখানি শরীরের নয়, যতখানি মনের ; আগের জিনিষটি ছিল সরল সোজা,

কিন্তু এখনকার মধ্যে আসিয়াছে কুটিলতা কার্পণ্য—মানি অথচ মানি না, মনের প্রাণের এক অংশ মানিতে চায় আর এক অংশ চায় না। উপর নীচ এখনকার দিনে আবার থাকে থাকে সাজান (Bur··aucracy) ; প্রত্যেকের আছে দুই রকম ভঙ্গী,উপরের দিকে তাকায় আপনাকে যে পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া,নীচের দিকে তাকায় আপনাকে সেই পরিমাণে বিস্ফারিত করিয়া। তবে দুঃখের কথা নীচের দিকে তাকাইবার অবকাশ সকলেরই জোটে না। এ ক্ষেত্রেও দেখি মুনিব বা হুজুর যে সব সময় অত্যাচার করিবার জন্যই চাকুরে বা মজুরের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহেন তাহা নয়, চাকুরের মজুরের উন্নতি বা মঙ্গলের জন্যই মুনিব হুজুর তাহাদের ভার গ্রহণ করেন।

এই ত হইল অবস্থা। কিন্তু সমাজের জগতের পতিতদের শূদ্রদের মধ্যে একটা চেতনা জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, কেহই অপর কাহারও ভার লইবার অধিকারী নয়। যে যত ছোট হীন অশক্ত হউক না কেন, সে বড়'র উন্নতের শক্তিমানের হাত ধরিয়া চলিবে না, বড় উন্নত শক্তিমানও তাহাকে কৃপা দয়া পরবশে হাত ধরিয়া চালাইতে চেষ্টা করিবে না। মুক্তির মধ্যেই শক্তির প্রতিষ্ঠা। নিজের প্রেরণায় নিজের সামর্থ্যে নিজের পথে প্রত্যেককে চলিতে দাও—ভুলচুক হউক ক্ষতি নাই, ভুলচুকের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজে যে আমি সত্য পাই তাহাই আমার খাঁটি সত্য, ঠেকিয়া যাহা শিখি তাহাই আমার আসল জ্ঞান। ছাত্রকে গুরুমহাশয় পিটাইয়া মানুষ করিবেন না, ছাত্রকে নিজের রুচি

নিজের কৌতুহল অনুসারে চালতে দিতে হইবে। পিতা পুত্রকে আপনার ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবেন না, পুত্র নিজেই নিজের ছাঁচ খুঁজিয়া গড়িয়া লউক। স্ত্রী স্বামীর প্রতিধ্বনিমাত্র হইবে না, স্ত্রীও আপন সত্তাকে বজায় রাখুক, নিজের নিজত্বকে ফুটাইয়া তুলুক। গরীবেরা তাই ধনীর বিরুদ্ধে, মজুরেরা মুনিবের বিরুদ্ধে আপন আপন সত্যকে সত্বকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য জোট বাঁধিতেছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের মানুষ দাঁড়াইয়াছে conscientious objectors রূপে, পরাধীন নেশন ক্রমে ক্রমে step by step নয় কিন্তু একেবারেই স্বাধীন হইতে চাহিতেছে।

কালো জাতি সাদা জাতির mandate স্বীকার করিতে নারাজ। এ যুগ শূদ্রেরই যুগ।

জগতের শূদ্রেরা অধিকারী ভেদ বলিয়া কোন জিনিষ মানিতে চাহিতেছে না। অধিকার সকলেরই সমান। অধিকার বা দাবী অনুসারে সামর্থ্য আছে কিনা তাহা প্রত্যেকে নিজে বুঝিয়া দেখিবে —অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কিছু নাই, তাহা লইয়া মাথাব্যথারও প্রয়োজন নাই। স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে আমি যদি গোল্লায় যাই, তবে সে অধিকারও আমার থাকিবে, গোল্লায় যাওয়াটাই আমার তখন সার্থকতা। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে মানুষ গোল্লায় যাইতে পারে না, ক্ষণকালের জন্য একটু বেচাল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয় করিবার কিছু নাই— প্রকৃতির নিয়মই এং রকম ঋজু কুটিল পথ ধরিয়া ঠিক লক্ষ্যে গিয়া পৌছান। স্বাধীন হইলে আয়র্লণ্ড বা ভারতবর্ষ ধ্বংস পাইবে সে

ভয়টা আসল ভয় নয়, আসল ভয় হইতেছে আয়র্লণ্ড বা ভারতবর্ষের কর্ত্তাদের বড় অসুবিধা হইবে। রুসিয়া আপন ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিলে রুসিয়ার যে বিপদ হইবে, সেটাকে খুব ফলাইয়া বলি, আসল বিপদ যে ইউরোপের কর্ত্তাজাতিদের হইবে সেই কথা উহাতে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের মাথার কাছে যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি বাড়াইয়া দেন, তাহা কতখান শূদ্রদের পারত্রিক পারত্রাণের জন্য আর কতখানি নিজেদেরই ঐহিক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

কিন্তু কর্ত্তাদের দিক হইতে যে কৈফিয়ৎটা দেওয়া যায় সেটা অন্তঃসার শূন্য অথবা তাঁহাদের কথাটা যে একবার প্রণিধান করিবার যোগ্য নয়, তাহা না হইলেও হইতে পারে। কর্ত্তাদের পক্ষে আমরা ওকালতনামা লই নাই, কিন্তু আজকালকার যখন গোড়ার তত্ত্ব লইয়া ভাঙ্গাচুরা হইতেছে তখন সব দিকই নির্ব্বিকার ভাবে সমান নজর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। সমাজে বড় ছোট উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ শূদ্র যে একটা বিভাগ হইয়াছে হইতেছে সেটা দেখি সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের জিনিষ—সুতরাং তাহাকে সমাজের একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি না বলিয়া থাকা যায় না। বড় যারা, উচ্চ যারা, ব্রাহ্মণ যারা তাহারা যে এক সময়ে যুক্তি করিয়া জোট বাঁধিয়া এমন দুষ্কার্য্যটি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ রকম বলিলে মানুষসম্বন্ধে সমাজসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। এই যেমন Feminist বা Suffragetteদের মুখে একটা কথা অহরহ শোনা যায় যে মেয়েরা স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য বিহীন হইয়া পড়িয়াছে,

পুরুষের ছায়ায় পুরুষের পদতলে পতিত রহিয়াছে, সেটা হইতেছে পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কারসাজি—পুরুষেই সমাজ গড়িয়াছে নিজের সুখ সুবিধার জন্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা কি সম্ভব ? সমাজ যদি পুরুষেই গড়িয়া থাকে, তবে গড়িবার সময় মেয়েরা কোথায় ছিল ? মেয়েরা কেন তখন প্রতিবাদ করিল না বা নিজেদের সুবিধামত সমাজকে গড়িতে পারিল না ? যদি বল, পুরুষেরা জোর জবরদস্তি করিয়া বা ভুলাইয়া ভালাইয়া এরূপ করিয়াছে—কিন্তু মানবজাতির এক অর্দ্ধেক আর অর্দ্ধেককে এমন ভাবেই ভেড়া বানাইয়া ফেলিল, বিশেষতঃ দুই অর্দ্ধেকের সম্বন্ধ যখন এমনতর যে একজনের সাহচর্য্য সহযোগীতা ছাড়া আর একজন একপদ অগ্রসর হইতে পারে না ? আর ইতিহাসে জোর জবরদস্তির—সে ভুলানের ভালানের প্রমাণ কোথায়ও দেখিতে পাই কি ? বলা যাইতে পারে, জিনিষটি আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিয়াছে, এক দিনে হয় নাই, মেয়েরা আজ দেখিতে পাইতেছে তাহারা কি রকমে ধীরে ধীরে জালের মধ্যে পা দিয়া ফেলিয়াছে। কথাটা সত্য হইতে পারে—কিন্তু ইহাতে পুরুষের দোষ নাই, পুরুষেরা সজ্ঞানে দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে এ কাজ করিয়াছে তাহা নয়। সমাজের একটা প্রেরণায় স্বভাবেরই টানে পুরুষ এই ভাবে চলিয়াছে, শুধু তাই নয়, মেয়েরাও তাহা মানিয়া লইয়াছে। এই শেষ কথাটা আমরা সহজেই ভুলিয়া যাই, কিন্তু সেইটাই আসল কথা। মেয়েরা যে পুরুষের উপর এত নির্ভরশীল, পুরুষের ছায়া বা প্রতিধ্বনির মত হইয়া উঠিয়াছে তার গোড়ার কারণ, মেয়েদের স্বভাবে নিশ্চয়ই এই রকম একটা

জিনিষ আছে, এই রকম হওয়ায় মেয়েরা একটা আনন্দ একটা তৃপ্তি একটা সার্থকতা পাইয়াছে। হইতে পারে, পুরুষেরা শেষে মেয়েদের এই দৌর্ব্বল্য টের পাইয়া, আরও সুবিধা করিয়া লইয়াছে, বাঁধনটা আরও কসিয়া ধরিয়াছে। মেয়েরা অভ্যাসক্রমে অন্ধভাবে তাহাতে সায় দিয়াছে; কিন্তু এটা গোড়ার সত্য নয়। সেই রকম শূদ্রেরাও যে ব্রাহ্মণের পদতলে, তার কারণ ব্রাহ্মণের আত্ম-প্রতিষ্ঠার লোভ হইতে পারে, সমাজের জন্য একটা বিশেষ আদর্শ ও সাধনা স্থাপনেব চেষ্টাও হইতে পারে, কিন্তু আর একটা কারণ ব্রাহ্মণের পদতলে থাকিয়া শূদ্রের নিজেরই একটা লোভ ও তৃপ্তি। ভারতবর্ষ যে বিদেশীর অধীন, এসিয়া বা আফ্রিকা যে ইউরোপের ছায়াতলে, কালা লোক যে সাদা লোকের খেলার পুতুল, তার কারণ একের ছল বল কৌশল হইতে পারে কিন্তু তাহাতে অপরের সম্মতি, তৃপ্তি যে কিছুই নাই তা'ও বলা চলে না।

বড় যে ছোট'র উপর কর্ত্তৃত্ব করে, তাতে বড়'র অভিমান আছে অনেকখানি সন্দেহ নাই; কিন্তু কর্ত্তৃত্বেব পাত্র হইয়া ছোট'রও যে কিছু অভিমান নাই তাহাও নয়। আমি এমন মনিবের চাকর, আমি এমন হাকিমের হুকুমবরদার—এই বলিয়া আমি যে গর্ব্ব অনুভব করি সেটাও ত কম সত্য নয়। গুরুর গুরুত্বকে বাড়াইয়া উঁচাইয়া, আপনাকে দীনাতিদীন মনে করিয়া শিষ্যই যে চরিতার্থ হয়। আমি নিজে সামান্য অশনভূষণে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, কিন্তু আমার রাজাকে আমি দেখিতে চাই ছত্র চামর, আশা সোটা, লোকলস্করে পরিবৃত করিয়া। ধনীর ঐশ্বর্য্যকে দেখিয়া সব

সময়ে যে ঈর্ষান্বিতই হই, তা নয়, বরং সেটা নিজে দেখিয়া অপরকে দেখাইয়া কি একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। বড়'র পূজা বলিয়া মানুষের মধ্যে আছে যে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাই বড়'র বড়ত্বকে টিঁকাইয়া রাখিয়াছে। বড় ছোট যদি না থাকে, সকলেই যদি সমান হয়, তবে মানুষের এই বৃত্তিটির গতি কি হইবে? আর এটা যদি এমন স্বাভাবিকই হয় তবে 'স্ব স্ব প্রাধান্য' জিনিষটি সমাজে আসিবে কি করিয়া?

অপর পক্ষের উত্তর, যাহা স্বাভাবিক তাহাই আদর্শ নয়, যাহা অতীতে ছিল বর্ত্তমানে চলিয়াছে তাহাই ভবিষ্যতের চিত্র নয়। আর স্বভাবের গতি বিচিত্র, নানামুখী। অতীতে বর্ত্তমানে এক রকম স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া সমাজে এক রকম শৃঙ্খলা এক রকম আদর্শ উঠিয়াছে। সে শৃঙ্খলার সে আদর্শের ভোগ হইয়া গিয়াছে। Slave mentalityএর যে সত্য সেটা ভবিষ্যতের কথা নয়। মানুষকে আর এক রকম mentality পাইতে হইবে, আর এক রকম স্বভাব আর এক রকম আদর্শ সমাজে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আধুনিক যুগের সকল বিপ্লব বিলোড়ন দিতেছে সেই মন্ত্র।

নেশনের মূল্য

সার্ব্বভৌমিক ভাব লইয়া আজ অনেকে দাঁড়াইয়াছেন নেশন-ভাবের বিরুদ্ধে। তাঁহারা চাহেন বিশ্বমানবের মহাসম্মেলন কিন্তু ইহার মধ্যে নেশনের স্থান কি সার্থকতা কি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, নেশন-ভাবটি বরং সে মহামিলনের পথে কুৎসিত কণ্টকরূপেই তাঁহাদের চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছেন জগতে নানাত্ব থাকিবে থাকুক, বিভিন্ন জাতি বা জনসঙ্ঘ তাহাদের বিভিন্ন শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা লইয়া মানব সমাজকে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্যতানে ভরপুর করিয়া তুলিবে এ কথাও মানিয়া লইতে প্রস্তুত। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন, প্রত্যেক সঙ্ঘও তেমনি আপন আপন বিশিষ্টতাটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া ঐক্যের সামঞ্জস্যের মধ্যে শোভনাঙ্গ হইয়া উঠিবে—কিন্তু সে জন্য নেশনের প্রয়োজন কি? নেশনই ত এই আদর্শের একমাত্র বাধা। কারণ নেশন আর কিছুই নয়, তাহা হইতেছে জাতির মূর্ত্ত অহঙ্কার, সম্মিলিত প্রাণের পশুসুলভ উদ্দাম ভোগপরায়ণতা অত্যাচারপ্রিয়তা। যখন একটি জাতিকে এমনভাবে গড়িয়া তুলি যে সে চায় কেবল নিজেরই প্রতিষ্ঠা, যখন তাহার সমস্ত জীবনপ্রবাহ সমস্ত শক্তির ধারাগুলিকে এমনভাবে

সাজাইয়া গুছাইয়া নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলি যাহার উদ্দেশ্য হয় পরকে দমনে রাখা, বিশ্বের ঐশ্বর্য্যকে আত্মসাৎ করা তখনই জাতি ধারণ করে নেশনের বিকট রূপ। তাহার আশ্রয় তখন শুধু পশুবল আর চাতুরী। তখনই কুটিল রাজনীতি, ঘোর সৈন্যসম্ভার, অতিকায় ব্যবসা বাণিজ্য তাহাদের সহস্র ফণা তুলিয়া চারিদিকে বিষ উদ্গীরণ করিতে থাকে, নিজের জাতির যে প্রাণটি তাহাকেও ক্রমে আপন কুণ্ডলীমধ্যে ধরিয়া পিশিয়া ফেলে। পৃথিবীর যাবতীয় জাতি যদি মৈত্রীর মধ্যে সৌভ্রাত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায় তবে সর্ব্বাগ্রে নেশনত্বটি দূর করিতে হইবে। নেশন যে চায় শুধু নিজেকে, পরকে সে সহ্য করিতে পারে না। আর নিজেকে যে চায় সে চাওয়াও শুধু বাহিরের জিনিষ,স্থূল বৈভব—জাতির নেশনের অন্তর্ভুক্ত জনসঙ্ঘের যে উজ্জ্বল প্রতিভা, যে নিগূঢ় দীক্ষা, যে আধ্যাত্মিক বিশিষ্টতা তাহাকে যে চাপিয়াই রাখিতে তার চেষ্টা।

আমরা স্বীকার করিলাম নেশনত্বের এ সকল দোষ আছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অহঙ্কার জিনিষটি আদৌ কি? ইহার কি কোন সার্থকতা নাই? আমরা মনে করি খুবই আছে, একটা গভীর সত্যকেই আশ্রয় করিয়া এই অহঙ্কারের খেলা। জগতে কোন জিনিষই একেবারে মিথ্যা বা নিরর্থক নয়, সব জিনিষকেই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য, সব জিনিষের মধ্যেই ভরিয়া দিয়াছেন একটা সত্যপ্রাণ, একটা শ্রেয়স্করী প্রেরণা। অহঙ্কার হইতেছে ব্যক্তির বা ব্যষ্টির আত্মসত্তায় জাগরণ চেষ্টা, নিজের নিজত্বটুকু, অপর হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু জাগ্রত-

ভাবে ফুটাইয়া ধরিবার প্রয়াস। জগতে একটা ক্রমবিকাশ চলিয়াছে, প্রথম ধাপে হইতেছে প্রকৃতির অন্ধখেলা। মানুষ যখন তাহার জীবন খেলা সবে আরম্ভ করিয়াছে তখন তাহার আত্মবোধ, তাহার বিশিষ্টতাটি থাকে যবনিকান্তরালে তমসাবৃত হইয়া। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলে সাধারণভাবে জীব-অভিব্যক্তির সম্বন্ধেও এই একই সত্য প্রযোজ্য। তখন তাহার জীবনে, জাগতিক লীলায় সে আত্মা সে বিশিষ্টতার একটা ছাপ থাকে বটে কিন্তু তাহা অস্পষ্ট, যেন একটা আবরণের মধ্য দিয়া দেখা দিতেছে, নিজেকে সে নিজে সাক্ষাৎভাবে দেখে নাই। সেখানে সবই তরল বাঁধনহীন আপনহারা গড্ডলিকাধারা। তাহা হইতেছে in-tinctএর প্রাকৃতিক প্রেরণার রাজ্য—প্রতিভার যাহা সৃজন, নূতন গড়ন তাহা কিছু সেখানে নাই। বাহুল্যকে অনাবশ্যককে কাটিয়া ছাঁটিয়া, জীবনের সকল সূত্র টানিয়া ধরিয়া একমুখী লক্ষ্যযুক্ত করিবার কোন প্রয়াস নাই। প্রকৃতির, স্বভাবের, সংস্কারের গতানুগতিক অভ্যাসের ফলে যে একটা সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিয়াছে অন্ধভাবে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারই রেখায় রেখায় ঘুরিয়া ফিরিয়া চলাই তখনকার ধর্ম্ম। কিন্তু জীবাত্মা যখন চায় স্ফুট হইয়া উঠিতে, নিজের জীবন জাগ্রত-ভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত পরিবর্দ্ধিত করিতে, আপনার যে ভবিষ্যৎ যে অশেষ সম্ভাবনীয়তা তাহা তলাইয়া দেখিতে, তাহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে তখন সে তাহার নিছক প্রকৃতিদত্ত প্রকৃতিটি, তাহার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মগণ্ডীটি কাটাইয়া উঠে। তাহার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয় বুদ্ধি বিচার, জাগিয়া উঠে অহংভাব। তাহার চেষ্টা

হয় তখন জানিতে বোধ করিতে সে কি, সে কি হইতে পারে। বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সে চায় তাহার নিজের পরিমাপ, তাহার নিগূঢ় ঈশ্বরত্বের পরিস্ফুরণ। আর তখনই সে হয় অসুর। চারিদিকে আপনাকে বিসারিত করিয়া দিয়া বীর বিক্রমে সকলকে মথিত করিয়া সে আপনার স্বাতন্ত্র্য, আপনার আত্মশক্তি, আপনার সত্বার পরিধির সহিত পরিচিত হইতে চায়, তাহাকে জাজ্বল্যমান করিয়া কর্ম্মজগতে প্রকট করিতে চায়। ফলে সে একটা আতিশয্য, অসামঞ্জস্য, একটা বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি করে বটে; কিন্তু আত্মার মধ্যে সজাগভাবে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ইহা তাহার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়—পার্থক্যকে দ্বন্দ্বকে যত পরিস্ফুট করিয়া তুলিব নিজের সহিত ততই গভীর ততই জাগ্রত সম্বন্ধ স্থাপন করিব। ক্রমবিবর্ত্তনের এইটিই হইতেছে দ্বিতীয় ধাপ। তার পরের ধাপ হইতেছে মিলনের সামঞ্জস্যের। আত্মার স্বাতন্ত্র্যে প্রবুদ্ধ হইয়া, নিজের বিভূতির সমস্তখানি আলিঙ্গন করিয়া তখন জীব হৃদয়ঙ্গম করে তাহার শক্তির একটা সীমা আছে, স্বাতন্ত্র্য অর্থ স্বেচ্ছাচার নহে। তাহার আছে শুধু বিশেষ ধর্ম্ম, বিশেষ কর্ম্ম, বিশেষ তন্ত্র; সেইটুকু পরিপূর্ণ করাতেই তাহার সব। সেই রকম অপর সকলেরও আছে একটা বিশেষ ধর্ম্ম, বিশেষ কর্ম্ম, বিশেষ তন্ত্র। প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের পার্থক্য থাকিলেও দ্বন্দ্বের কোন প্রয়োজন নাই। বরং পরস্পর পরস্পরের বৈশিষ্ট্যকে সাহায্য করিয়া উপচিত করিয়া জগতে একটা বিপুলতর মহত্তর সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, আত্মপ্রতিভাকে

অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটা মাৎসর্য্যও অবশ্যম্ভাবী, এমন কি অবশ্য প্রয়োজনীয়। অকালসিদ্ধ ঔদার্য্য সৌহার্দ্দ্য হইতে স্বধর্ম্মকে অব্যাহত রাখিয়া, সর্ব্ববিধ উপায়ে ইহাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াই প্রকৃত ঔদার্য্য সৌহার্দ্দ্য গরীয়ান সামঞ্জস্যেরই দৃঢ়তর ভিত্তি স্থাপন করিব।

জাতি বা সঙ্ঘ সম্বন্ধেও এই একই কথা। প্রকৃতির বিবর্ত্তন-ধারার অব্যর্থ প্রেরণাবশেই নেশনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা আধুনিক যুগের ইউরোপের দান। তাই বলিয়া ইহা অসত্য বা হেয় কিছু নয়। নেশনবাদ চায় জাতির সঙ্ঘের আত্মাকে জাগ্রত জীবন্ত স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ আপন অখণ্ড প্রতিভায় ভরপুর করিয়া ধরা। পূর্ব্বে যে লোকসমাজ ছিল (peoples) তাহা ছিল প্রকৃতির কোলের জিনিষ, আপনাকে ভাল করিয়া চিনিত না, স্বধর্ম্মের মহিমায় আপনার সমগ্র অখণ্ড সত্তায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে নাই—তাহার প্রয়োজনও সে বোধ করিত না। সে চলিত অন্ধ প্রাকৃতিক প্রেরণার বশে, আত্মচৈতন্য তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যেদিন সাড়া পড়িল জাতির আত্মা স্বাতন্ত্র্যে জাগিয়া উঠুক, চক্ষু মেলিয়া সে দেখুক তাহার মধ্যে কোন্ ভগবান রহিয়াছেন এবং সেই উপলব্ধি অনুসারে জীবনকে নূতনভাবে গড়িয়া সৃজিয়া চলুক, সেই দিনই নেশনের আবির্ভাব। নেশন জাতির অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহাই যে নিজত্বকে স্ফুটভাবে তীব্র-ভাবে বোধ করিবার, আপন ভাগবৎ সত্তা ও ঐশ্বর্য্য পাইবার তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট পন্থা।

লক্ষ্য—জগতে সকল জাতির এক মহাসম্মেলনস্থাপন, কিন্তু কোন জাতির স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নয়। সকলেরই থাকিবে সমান মর্য্যাদা, সমান অধিকার। ইউরোপের সৌভাগ্য তাহার প্রত্যেক জাতিই নেশনত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার মর্য্যাদা, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে—আপন ব্যক্তিত্বকে কেহ আক্রমণ করিতে আসিলে সে এই নেশনত্বরূপবর্ম্মেই আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। আর সেইজন্যই জগতে আজ যে Federation of Nationsএর আদর্শ শুনিতেছি তাহাতে ইউরোপীয় অথবা ইউরোপীয় ধারায় চলিয়াছে যাহারা তাহাদেরই কেবল স্থান হইতেছে। এশিয়ার স্থান সেখানে নাই। কারণ এশিয়ার জাতিসকল সময়ের সাথে পা ফেলিয়া চলিতে পারে নাই। সে রহিয়াছে অন্ততঃ সেদিনও ছিল আদিম যুগে। জাতির নিজত্বের মর্য্যাদা যথাযথ বুঝে নাই, তাহার যে একটা আত্মাই আছে তাহাও পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে নাই, তাহাকে শরীরী করিয়া ধরিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। জাতিকে নেশনে গড়িয়া তুলে নাই। এক জাপান পারিয়াছিল তাই বিশ্বসভায় জাপানের স্থান হইয়াছে। আমরা ভারতবাসী আধ্যাত্মিকতা আমাদের গর্ব্ব, আমরা শ্লাঘা করি জগতের সকল আলোড়ন বিপ্লব সকল জড়বাদ সংশয়বাদের বিভীষিকার মধ্যে আমরাই অধ্যাত্মধনকে জিয়াইয়া রাখিয়াছি। সত্য কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা যে নেশন হইয়া উঠিতে পারি নাই ইহাও যে কিছু মাহাত্ম্যের বিষয় তাহা নয়। ভারতের আধ্যাত্মিকতা কেবল আপনাকে কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র,

গহ্বরে অরণ্যে লুকাইয়া তাহার ক্ষীণ প্রাণটি ধুক্ ধুক্ করিতেছে মাত্র। সে আধ্যাত্মিকতা বিপুল বিশ্বগ্রাসী হইয়া উঠিল না কেন, আপন দুর্ব্বার শক্তিতে জগতকে ভাসাইয়া দিল না কেন? সে আধ্যাত্মিকতার আধার যে ভারতের অধিবাসী সকল তাহারা এমন অল্পপ্রাণ, সর্ব্বদা ভয়চকিত কঙ্কালসার হইয়া উঠিয়াছে কেন? আমরা মনে করি, ইহার কারণ প্রথমতঃ আমরা চিনিয়াছি কেবল ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা কিন্তু জাতির অধ্যাত্মসত্তা বুঝি নাই আর দ্বিতীয়তঃ বুঝিলেও তাহার জন্য একটা বিগ্রহ সৃষ্টি করি নাই, তাহাকে স্থূলে পর্য্যন্ত সজাগ পরিপূর্ণ করিয়া ধরিবার কোন পন্থা বাহির করি নাই। নেশনই যে জাতির অধ্যাত্মসত্তার এই জাগ্রত বিগ্রহ, এ মহাসত্য উপলব্ধি করি নাই।

নেশনত্ব এই মহাশিক্ষা দিতেছে যে ব্যক্তির যেমন আছে দেহ প্রাণ মন, জাতিরও ঠিক সেই রকম আছে দেহ প্রাণ মন। জাতির দেহ হইতেছে দেশ, প্রাণ হইতেছে তাহার ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তি, মন হইতেছে ব্রাহ্মণ্যশক্তি। আধুনিক ভাষায়, ভৌগলিক আয়তন সৈন্যসম্ভার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা এই কয়টি জিনিষ লইয়া জাতির পূর্ণ সত্তা। নেশন চায় জ্ঞানতঃ এ সকলকে কেন্দ্রীভূত, পরিচালিত পরিবার্দ্ধিত করিতে, একটা নিগূঢ় আত্মপ্রতিভার ঐশ্বর্য্য ইহাদের সকলের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে। কোন অংশকে বর্জ্জন করিতে সে প্রস্তুত নহে। আদর্শ হইতেছে সকলকে সামঞ্জস্যের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত উপচিত করিয়া ধরা, ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে ভাগবত প্রেরণার মধ্যে সকলকে যথাসন্নিবেশ করা এবং অন্যান্য জাতির

বিগ্রহের সহিত সৌভ্রাত্রসূত্রে মিলিয়া মিশিয়া চলা। কিন্তু প্রয়োজনানুসারে, যুগধর্ম্মের বিধানে যদি ক্ষাত্র ও বৈশ্য শক্তির উপর বিশেষ জোর দিতে হয়, দেশমাতৃকার দেহটি লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে হয় তবে তাহাই করিতে হইবে। মহাসম্মেলনের আদর্শ যদি কিছু-কালের জন্য ভুলিয়াই যাইতে হয় তবে তাহারও সার্থকতা আছে। ক্ষণিকের পশ্চাৎগমন সে যে একটা উদারতর ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ভাবেই অগ্রসর হইবার জন্য শক্তি সংগ্রহ। নেশনত্বের মধ্য দিয়াই জাতি বিশ্বজাতির সহিত পূর্ণতর জাগ্রততর সম্বন্ধ স্থাপন করিবে—সংঘর্ষের মধ্যে আপনাকে চিনিয়া পরকে চিনিয়া একটা মহীয়ান্ সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করিবে। নেশনত্ব যিনি ধ্বংস করিতে উপদেশ দিবেন তিনি চাহিবেন জাতি যেন আবার ফিরিয়া যায় তার প্রাকৃত তামসিক অবস্থায়। নিগ্রহের মন্ত্র দিয়া তিনি লয়েরই পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। নেশনবাদ দূষণীয় হইতে পারে কিন্তু নেশনত্ব দূষণীয় নহে। অহংকারের, পার্থিব বস্তুর প্রতি অতিভক্তি আদর্শ নহে—তাহাকে সংযম করিতে হইবে। সংযম চাই কিন্তু নিগ্রহ নয়। ইহাই ত গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ। সংযম অর্থাৎ পরিশুদ্ধ করিয়া তুলা, অন্তর্নিহিত সত্য সত্তাটির মধ্যে উঠাইয়া ধরা। অহঙ্কারেরই মধ্যে যে রহিয়াছে তোমার ভাগবত স্বাতন্ত্র্যের সজাগ অনুভূতি, পার্থিব সম্পদের প্রতি লিপ্সারই মধ্যে যে রহিয়াছে তোমার ভাগবত ভোগপ্রেরণা। দোষের বলিয়া সে সকলকে নিগ্রহ করিলে, ধ্বংস করিলে এ সকল কিছুই তুমি পাইবে না। বরং সে তোমার হইবে মৃত্যুর পথ।

স্বদেশী ও বিদেশী

ইউরোপ হইতে আমাদের ভারতবাসীর কিছু শিখিবার গ্রহণ করিবার আছে কি না, থাকিলেও শিক্ষা করা গ্রহণ করা উচিত কি না—এ প্রশ্নটি নূতন করিয়া আবার সুধী সমাজে আন্দোলন তুলিয়া দিয়াছে। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির আছে একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বভাব স্বধর্ম্ম; এই বৈশিষ্ট্য এই স্বভাব স্বধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া দেশকে জাতিকে দাঁড়াইতে হইবে, এ জিনিষটি যে হারাইবে, জীবনও সে হারাইবে। যে-দেশ যে-জাতি নিজের কি আছে বা না-আছে সেদিকে মোটেও দৃষ্টি না দিয়া, কেবল পরের দিকে তাকাইয়া পরের অনুকরণেই ব্যস্ত তাহার অস্তিত্ব তো লোপ পাইবার বেশী বিলম্ব নাই। কারণ জীবন হইতেছে নিজের ভিতর হইতে ফুটাইয়া ছড়াইয়া গড়িয়া তোলা। এই নিভৃত আবেগই সৃজন করিয়া তুলিয়াছে তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন, তোমার ধরণধারণ আচারব্যবহার রীতিনীতি—এ-সকলের সাথে তোমার আছে একটা সহজ মিল, এ সকল হইতেছে তোমারই প্রতিভার শক্তির জীবনধারার প্রকাশের প্রণালী। কিন্তু এই ভিতরের সৃজন

আবেগ যাহার নাই, যাহার ধরণধারণ আচারব্যবহার রীতিনীতি নিজের অন্তর হইতে সৃষ্ট নয়, বাহির হইতে আরোপিত মাত্র, ভিতর হইতে যে আপনার বিশিষ্ট সাড়া দিতে পারে না, কেবলই যে বাহিরের আঘাতে অসহায়ভাবে সরিয়া ঘুরিয়া চলে সে ত জড়পদার্থমাত্র।

ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু কথা হইতেছে জীবন অর্থ ভিতর হইতে সাড়া দেওয়া, সৃজন করা হইলেও, সেই সাথে বাহির হইতেও সে যে কিছু আহরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে না—এমন নিষেধ তাহার পক্ষে থাকিবেই কি? বীজ হইতে বৃক্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে, বীজের অন্তঃস্থ প্রাণশক্তির বলেই, সত্য কথা; কিন্তু বাহিরের জল মাটী আলো বাতাস এ সকলেও প্রয়োজন আছে। মানুষের পক্ষে, দেশ বা জাতির পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য। বাহির হইতে গ্রহণ করিবার আহরণ করিবার পক্ষে কিছু বাধা নাই কিন্তু চাই হজম করিবার, আপনার মধ্যে মিলাইয়া মিশাইয়া লইবার শক্তি, চাই ভিতরের সেই সজাগ আত্মসংস্থা যাহা বাহিরকে পরকে আপনার প্রয়োজন অনুসারে আপনারই ছাঁচে গলাইয়া ঢালিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। আমের বীজ জল মাটী আলো বাতাস লইয়া আমের গাছকেই সৃষ্টি করিয়াছে, কাঁঠালের গাছ সৃষ্টি করে নাই; কাঁঠালের বীজও তেমনি সেই একই উপকরণের সহায় লইয়া কাঁঠাল গাছকেই গড়িয়াছে, আর কোনও গাছ সে হইয়া পড়ে নাই। প্রত্যেক মানুষও তেমনি বাহিরের জল বায়ু আহার্য্যকে অথবা ভাষা ভাব চিন্তাকে আপনার ভিতরের বিশিষ্ট ধর্ম্মের

স্বভাবের অনুসারে আহরণ করিয়া বদলাইয়া নিজের নিজের পৃথক রকম শরীর, পৃথক রকম কথা কহিবার ভঙ্গী, পৃথক রকম প্রাণ মন গড়িয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু কথা উঠিতে পারে, বাহির হইতে জিনিষ লইতে পারি কিন্তু এ বাহির হইতেছে যাহা সাধারণ যাহা সর্ব্বত্র; বিশ্বে যে সব সামগ্রী পড়িয়া আছে সেখান হইতে সকলেই আপন প্রয়োজন অনুসারে যাহা যতটুকু যেভাবে গ্রহণ করে করুক, কিন্তু বিশেষের কাছে সেজন্য যাওয়া উচিত নয়, সম্ভবও নয়। আমের যাহা দরকার সে তাহা পাইবার জন্য কাঁঠালের নিকট যায় না, যাইতে পারে না—আম ও কাঁঠাল উভয়েই আহরণ করে প্রকৃতির অনন্ত উন্মুক্ত ভাণ্ডার হইতে। ঠিক সেই রকম ভারতবর্ষের ইউরোপ হইতে কিছু আহরণীয় নাই, থাকিতে পারে না। ভারতের যাহা প্রয়োজন সে লইয়াছে, লইবে বিশ্বসৃষ্টি হইতে, বিশ্বমানব হইতে, ভগবানের অসীম অগাধ ঐশ্বর্য্য হইতে, আপনার সাধনার স্বধর্ম্মের জোরে। সেজন্য ইউরোপের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই।

ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষা বিধিব্যবস্থা ইউরোপের স্বভাবের স্বধর্ম্মের পরিণতি, উহার মধ্যেই ইউরোপের প্রাণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, উহার মধ্যেই ইউরোপের অন্তরাত্মার সার্থকতা। ভারতবর্ষও তেমনি আপন জীবনদেবতার নির্দ্দেশ অনুসারে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহার বিশেষ রীতিনীতি—এ সকল বদলাইয়া ফেলিয়া পরের মাপে কাটা, পরের প্রয়োজন অনুসারে তৈয়ারী করা পরিধান সে যদি নিজের অঙ্গে লয় তবে অনাচার ফল হইবে

কি ? এস্কিমোদের দেখাদেখি আমরাও যদি সেই রকম পশমের স্তূপে ডুবিয়া থাকি তবে দম বন্ধ হইয়া মরা ছাড়া আর আমাদের কোন পরিণাম নাই।

প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে, তাহা কেন, মানুষের ত বুদ্ধি বলিয়া একটা জিনিষ আছে, নির্ব্বোধের মত পরের যাহা তাহা অনুকরণ করিব কেন ? অপরের মধ্যে যাহা ভাল, বাছিয়া সেটুকুই আহরণ করিব, মন্দটুকু করিব না। ভারতের স্বধর্ম্ম স্বভাব বা প্রকৃতিতে যাহা খাপ খায়, উহাকেই যাহা জাগাইয়া ফুটাইয়া ধরে, এমন সব জিনিষ ইউরোপ হইতে গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। শুধু সাবধান হইতে হইবে, ইউরোপের যে দোষগুলি তাহা যেন এড়াইতে পারি, আমাদের জাতির প্রাণের অন্তরাত্মার পক্ষে যাহা অনিষ্টকর এমন কিছু যেন না আমদানি করি।

কিন্তু এমন কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা কি আকাশ-কুসুম রচনা করিতেছেন না ? কার্য্যতঃ এই উপদেশ অনুসারে চলা কি অসম্ভবই নয় ? কারণ প্রথমতঃ ভালমন্দের মানদণ্ড কি, কে তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিবে ? তারপর প্রত্যেক জাতি তাহার ভালমন্দ দোষগুণ লইয়াই এক অখণ্ড জীবন্ত। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যাহাকে ভাল বল আর যাহাকে মন্দ বল, উভয়ই ইউরোপের জীবন-প্রতিভার বিকাশ, উভয়কেই আশ্রয় করিয়া ইউরোপের বিশেষত্বটি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে—এক অচ্ছেদ্য নাড়ীর ব[illegible] উভয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশামিশি মাখামাখি

হইয়া আছে। তোমার ইচ্ছামত ভালটুকুকে শুধু আলাদা করিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া আনিতে পার না। ভাল'র সাথে অব্যর্থভাবে মন্দেরও অনেকখানি উঠিয়া আসিবে। ভারতবর্ষেরও বিধিব্যবস্থা জীবনধারা এই ভালমন্দ উভয়কে লইয়া—সে ভাল, সে মন্দেরও মধ্যে ভারতের বিশেষত্বের, তাহার স্বধর্ম্মেরই ছাপ রহিয়াছে। সুতরাং ভারতের মন্দকে সংস্কার করিতে হইলে, শুদ্ধ করিতে হইলে, করিতে হইবে ভারতেরই ভাল দিয়া; সেজন্য ইউরোপের ভাল'র কাছে যাইতে হইবে কেন, সেজন্য ইউরোপের ভালকে আনিতে যাইয়া ইউরোপের মন্দটুকুও সঙ্গে সঙ্গে আনিবার বিপদ আলিঙ্গন করিতে যাইব কেন?

এ কথা যদি সত্য হয় তবে ত দেখিতেছি সৃষ্টির মধ্যে—বস্তুতে বস্তুতে জীবে জীবে জাতিতে জাতিতে আদান প্রদান বলিয়া কোন জিনিষ নাই; যদি কিছু থাকে তবে তাহা মঙ্গলজনক নহে, কারণ তাহাতে উৎপত্তি হয় ধর্ম্মসঙ্কর অর্থাৎ অনাচার অপচার উচ্ছৃঙ্খলতা —একটা লণ্ডভণ্ড (chaos), সেখানে সকল জীবনের অবসান।

কিন্তু জীবনে আদান প্রদান নাই বা থাকা উচিত নয় এত বড় কথা কি কেহ সত্য সত্যই নির্ব্বিকারচিত্তে বলিতে পারেন? জীব আপনারই নিভৃত জীবন-প্রতিভাকে উন্মেষিত করিয়া পৃথিবীর উপর আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে, একথা যেমন সত্য, আবার জীবে জীবে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সংঘাতে সংঘর্ষে আদানে প্রদানেও সে প্রতিভা ফুটিয়া উঠিবার সুবিধা পাইতেছে, একথাও ঠিক তেমনই সত্য। শিক্ষা সাধনা উন্নতি, [illegible]রাত্মারই

বিকাশ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অন্তরাত্মাকে সোজাসুজি খুঁজিয়া পাইবার ধরিবার অবকাশ সব সময়ে মিলে না, তাহাকে পাই গৌণতঃ, বাহিরের ধাক্কায়, অন্যত্র হইতে। নিজের মধ্যে নিজেকে নিজের ভাগবত সত্তাকে প্রতিভাকে প্রথমতঃ না দেখিয়া অনেক সময়ে সে জিনিষটিকে দেখিতে পাই ধরিতে পাই পরের মধ্যে। এইজন্যই ত শিক্ষকের গুরুত্ব, সতীর্থের সহচরের সার্থকতা।

পৃথিবীতে কেহ একা নিঃসঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। অনন্ত প্রকৃতির সাথে প্রত্যেক জিনিষটির যেমন লেনাদেনা চলিয়াছে, সেই রকম প্রত্যেক জিনিষটি প্রত্যেক জিনিষ হইতে কিছু গ্রহণ করিতেছে, আবার কিছু ফিরাইয়া দিতেছে। শরীরের জগতে, প্রাণের জগতে বিশেষের সহিত বিশেষে এই দান প্রতিদান ত চলিতেছেই—মনের জগতেও সেই একই ধারা বর্ত্তমান। ব্যক্তি হউক আর জাতিই হউক, ভাবের চিন্তার বিনিময় হইতেছে উহাদের ধর্ম্ম। নিজত্ব, বিশেষত্ব জিনিষটি সত্য কথা—এটি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অপরের সহিত সাহচর্য্য মিলামিশা হইলেই যে সে নিজত্ব বা বিশেষত্ব খর্ব্ব হইতে বাধ্য এমন কোন নিয়ম নাই। বরং এই মিলামিশাই এই সাহচর্য্যই নিজত্বের বা বিশেষত্বের উদ্বোধক হইতে পারে। বস্তুতঃ যে কোন জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

জাতির বিশেষত্ব যখন আমরা অতি সঙ্কীর্ণ করিয়া ধরি, পুরাতন সংস্কার বা কোন বিশেষ ভালমন্দ বা প্রিয়াপ্রিয়ের রুচির মানদণ্ডকেই একান্ত করিয়া ধরি তখনই ভয়ে ভয়ে চলিতে হয়,

স্বদেশী ও বিদেশী

কোন নূতন তথ্য নূতন আবিষ্কার অপরিচিত কিছুর সংস্পর্শে আসিলেই তাহাকে দূরে দূরে রাখিতে চাই, পাছে তাহারা পুরাতন পরিচিত জিনিষকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, অজানা অচেনা পরের ছোঁয়া পদার্থটি আমাদের বিশেষত্বকে নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু একথা আমরা ভুলিয়া যাই আত্মার বৈশিষ্ট্য অতি উদার জিনিষ আর তাহা অতীব সূক্ষ্ম। তুমি আমি তোমার আমার সংস্কার অনুসারে স্থির করিয়া ফেলি, ভারতের ধর্ম্ম এইটি, এই রকম পন্থাই ভারতের পন্থা—ইহা হইতে বিচ্যুত হইলে ভারতবর্ষ তাহার অন্তরাত্মার পথটি হারাইয়া ফেলিল। কিন্তু তাহা মোটেও নয়। বৈষ্ণব বলিবেন আহারের জন্য জীবহত্যা করিতে নাই—মুনিঋষিগণ ফলমূল খাইয়া থাকিতেন, শাস্ত্রের বচন আছে দগ্ধোদর ত 'শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে'—সুতরাং নিরামিষ আহারই ভারতের বিশেষত্ব, এষধর্ম্ম সনাতনঃ। শাক্ত বলিবেন মাছ মাংস মদ্য চাই, ভারতশক্তির সাধকগণ চিরদিনই তান্ত্রিক। বাঙ্গালী বলিবেন অবরোধপ্রথা ভারতীয় সমাজ বন্ধনের বিশেষত্ব—দাক্ষিণাত্যবাসী বলিবেন অন্য কথা। ব্রাহ্মণসমাজ বলিবেন জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে ভারতবর্ষ থাকিবে না, আর্য্যসমাজ বলিবেন জাতিভেদই ভারতের অবনতির কারণ। কাহার কথা মানিব, কে ভারতের প্রাণের তত্ত্ব, তাহার অন্তরাত্মার স্বধর্ম্মের খবর পাইয়াছে?

আমরা বলি, জাতির বিশেষত্ব, তাহার নিগূঢ় প্রতিভাকে বজায় রাখিতে হইলে, ফুটাইয়া তুলিতে হইলে এই রকম ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিবার কোন সার্থকতাই নাই। সকলের আগে চাই

জাতির জীবনটি জাগাইয়া তোলা। প্রাণে প্রাণে অন্তরাত্মার কূলে কূলে সে যাহাতে শক্তির আবেগ অনুভব করিতে পারে তাহাই হইতেছে প্রথম কাজ। অজীর্ণ রোগ যার তাহার পক্ষে কঠিন বিধিনিষেধের, অতি সাবধানতার প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু এই রোগটিকেই যে সহজ সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা বলিয়া ধরিতে হইবে তাহার কি মানে আছে? রোগীকে নিরাময় করিতে হইবে, শিরায় শিরায় প্রাণের তেজ ভরিয়া দিতে হইবে—যাহাতে লোহার মটর খাইয়াও সে জীর্ণ করিতে পারে। চিরদিন হাসপাতালে পড়িয়া জীবন কাটান একটা কিছু আদর্শ নহে।

ভারতবর্ষ আজ পরাধীন, জীবনীশক্তির বেগ তাহার মধ্যে আজ স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে—সেইজন্য তাহাকে বিশেষ সাবধানে থাকা ও চলা উচিত। একথা স্বীকার করিলেও আমরা মানিব না ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইবার, তাহার মধ্যে জীবনের প্লাবন বহাইয়া দিবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে বিদেশীর জন্য সকলের সংস্পর্শ হইতে সরিয়া আপনাকে ঢাকিয়া ঢুকিয়া রাখা। আমরা ত মনে করি ভারতবর্ষ আজ আর রোগী নয়, সে এখন বল স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিবার প্রয়াসী এখন তাহাকে ক্ষুধানুসারে পুষ্টিকর খাদ্য, যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গসঞ্চালনের অবকাশ দেওয়া চাই। তাহা না করিয়া এখনও যদি আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করি তবে মৃত্যুর পথই তাহার জন্য সরল করিয়া দিব মাত্র।

সে যাহা হউক, বিদেশ হইতে কিছু শিখিবার গ্রহণ করিবার

আছে কি না, এ সন্দেহ তখনই উপস্থিত হয় যখন আমরা মনে করি বিদেশ হইতে হুবহু গোটা একটা জিনিষ কিছু তুলিয়া লইয়া আমাদের জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বসাইয়া দিতে হইবে। তাহা নয়। ইউরোপ হইতে তাহাই আমরা শিখিব গ্রহণ করিব যাহা কেবল ইউরোপেরই নিজস্ব নয়, যাহা হইতেছে মানব সাধারণের বস্তু, ইউরোপ যাহা আগে পাইয়াছে বা যাহার চর্চ্চা করিয়াছে, ফলাইয়া ধরিয়াছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে ভগবান তাঁহার এক এক গুণ বা প্রতিভা খেলাইয়া তুলিয়াছেন, এক এক জাতির মধ্যে এক এক যুগে মানবপ্রকৃতিরই এক একটা মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কোন জাতি, সে যে গুণ ধর্ম্ম বিধি ব্যবস্থাকে আপনার করিয়া লইয়াছে তাহার মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। জীবাত্মা যেমন অনন্ত গুণের আধার, নানা দেহ ধারণ করিয়া নানা গুণ নানা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিকাশের উন্নতির পথে চলিয়াছে, ঠিক তেমনি দেশের জাতির অন্তর্য্যামী পুরুষও এক সঙ্কীর্ণ ধারায় গতানুগতিক পন্থায় চলে না, সে চায় আপনাকে বহুবিচিত্র করিয়া ধরিতে, নানা অভিজ্ঞতায় আপনাকে ভরপুর করিয়া তুলিতে। এই যেমন ভারতবর্ষকে আমরা জানি আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিকপ্রকৃতি বলিয়া। সত্য কথা। কিন্তু ইউরোপ যে জীবনের আধিভৌতিকতার রাজসিকতার আদর্শ ভারতের কাছে লইয়া আসিয়াছে তাহাও ভারতের পক্ষে মিথ্যা বা পরধর্ম্ম নহে। ভারতের অন্তরাত্মার লুক্কায়িত একটা বৃত্তিই আজ ইউরোপের ধাক্কায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

এ বৃত্তি ভারতেরও নয়, ইউরোপেরও নয়—এটি মানুষেরই বৃত্তি। যদি বল জীবনের কর্ম্মের আদর্শের জন্য ইউরোপের কাছে যাইব কেন, সাত্ত্বিক ভারতের আছে বা ছিল নিজস্ব একটা কর্ম্মের রজোবৃত্তির আদর্শ তাহাকে ফুটাইয়া ধরিলেই হইল। কিন্তু আমাদের কথা ইউরোপের কাছে সেজন্য গেলে দোষই বা কি? আমাদের কর্ম্মের যে আদর্শ ছিল তাহা কি এখন হুবহু আমরা বাস্তব জীবনে চালাইতে পারি, না তাহা চালান উচিত? আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, সে প্রাচীন সনাতন আদর্শ হইতে যে আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। বর্ত্তমানের উপযুক্ত করিয়া ধরিতে হইলে সে প্রাচীনকে সে সনাতনকে ত অনেকখানি পরিবর্ত্তন করিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের মানব ধর্ম্মের একটা প্রধান ধারা ইউরোপের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কালপুরুষের তৃতীয় নেত্রের একটা জ্যোতি আজ পাশ্চাত্যকে আলোকিত করিয়া ধরিয়াছে, আমরা যদি ইদানীং তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি তবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া কোন্ সুদূর অতীতে সেই রকম একটা কি আমাদের ছিল তাহার ধ্যানে মগ্ন না হইয়া, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বৃথা চেষ্টা না করিয়া যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই ভগবানের এই জাগ্রত বিকাশকে, যদি শিখি তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে তবেই ত আমাদের পথ সহজ সুগম হইয়া উঠে।

এ কথা সত্য আদর্শটি আনিতে যাইয়া আবার আদর্শের অপভ্রংশ বা বিকৃতিকে না লইয়া আসি, সে দিকে দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু ভালটি বাছিতে যাইয়া মন্দকে আনার আশঙ্কা ত সব ক্ষেত্রেই আছে। নিজের দেশের প্রাচীন গলিত দুষ্ট ধর্ম্মকর্ম্ম বিধিব্যবস্থার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ জাগ্রত আদর্শটি বাহির করা অপেক্ষা আমরা মনে করি বর্ত্তমানের জীবন্ত প্রাণবন্ত বিদেশ হইতে সে সব জিনিষ আহরণ করা বেশী ফলদায়ক। জীবনের সংস্পর্শে আসিলেই জীবন জাগিয়া উঠে— প্রাণের তরঙ্গে প্রাণ মিশাইয়াই প্রাণের স্ফূর্ত্তি।

প্রাণের মনের বিনিময়ে একটা ওলট পালট ঘটেই, কিন্তু তাহাতে ভয় করিবার কি আছে? শরীরের সহজ চেষ্টা যেমন তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কোন পদার্থকে হয় হজম করিয়া ফেলা নয় কোন রকমে বাহির করিয়া দেওয়া সেই রকম জাতির অন্তরাত্মারও চেষ্টা তাহার আধারে আহরিত জিনিষকে হয় নিজের করিয়া লওয়া না হয় উদ্গীর্ণ করিয়া ফেলা। যদি জিজ্ঞাসা কর, দেশের এ শক্তি ও সামর্থ্য আছে কি না? আমি বলি যে-দেশের এ ক্ষমতা নাই, তাহার কোন ভরসাই নাই, চেষ্টা করিয়া বাক্সবন্দী করিয়া সে-দেশকে জিয়াইয়া রাখিলেও রাখিতে পার, কিন্তু সে-দেশ কখনও সুমহান্ হইয়া উঠিবে না।

বাহিরের দিক হইতে দেখিলে আমাদের বোধ হয় বটে ভারতবর্ষ ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া ইউরোপের দ্বিতীয় সংস্করণ-মাত্র হইয়া উঠিতেছে, নিজের প্রতিভাকে হারাইয়া পরের ধারকরা আলোকে সে আজ উজ্জ্বল হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সেটি অতি বাহিরের ভাসাভাসা সত্যমাত্র। ভিতরের সত্য এই যে ইউরোপের জীবনের স্পর্শে ভারতের জীবন জাগ্রত সচল হইয়া

উঠিয়াছে। এবং এখন যে সে চারিদিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া যেখানে যাহা পাইবার আশা করে সেই দিকেই ছুটিয়া চলিতে ব্যগ্র, এমন কি অনেক সময়ে যে না বুঝিয়া সুঝিয়া আপনার প্রাণের ধর্ম্মের বিপরীত জিনিষকেই সে আঁকড়িয়া ধরিতে চায় তাহাতে প্রমাণ হয় তাহার ভিতরের নবজীবনের আবেগ আপনাকে ছড়াইয়া চারিদিক ছাপাইয়া ছুটিয়া চলিতে চাহিতেছে।

ভারতের এই নবোন্মেষিত জীবন-প্রতিভাকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি—নিঃশঙ্কচিত্তে উহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি আপনার পথ চিনিয়া লইতে, পরীক্ষা করিতে করিতে, যাচাই করিয়া দেখিতে দেখিতে, প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ বর্জ্জন করিয়া, আপনার অন্তরাত্মার স্বধর্ম্মেরই অনুরূপ সকল বিধিব্যবস্থা সকল প্রতিষ্ঠানাদি —সমগ্র আধারটি অখণ্ড সামঞ্জস্যে পূর্ণতায় গড়িয়া সাজাইয়া ধরিতে।

ইউরোপের দান

ইউরোপকে জড়বাদী বলিয়া উড়াইয়া দিবার একটা প্রয়াস আমাদের মধ্যে আজকাল দেখিতে পাই। ইউরোপের সহিত প্রথম সংস্পর্শে আসিয়া তাহার ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সকল বিষয়ে ইউরোপকেই আদর্শ করিয়া লইয়া ছিলাম। বর্ত্তমানে যে আবার অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয় ইউরোপের যাহা কিছু সকলই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছি, সেটা প্রথম যুগের অতিরিক্ত ভক্তির অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া মাত্র। এ ভাবটিকেও ঠিক ঠিক ন্যায়সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। ইউরোপ জড়বাদী হইতে পারে, কিন্তু জড়বাদী হইয়াও জগতের সাধনতন্ত্রের উন্নতি-কল্পে, মনুষ্যত্বের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে, ইউরোপের কি দিবার আছে, সেই কথাটা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না আমরা ইউরোপের দোষ কিছু দেখি না কিম্বা ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপরে ইউরোপের ইহলোকসর্ব্বস্ব আদর্শকেই স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

সুদূর অতীতে ভারতবর্ষ কিরূপ ছিল সে কথা আমরা তুলিব

না। কারণ, সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত কিছু জানা নাই; কেহ বলেন ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরমে পৌঁছিয়াছিল, কেহ বলেন কর্ম্মজগতের বিষয়েও সে অতুল প্রতিভা দেখাইয়াছিল, আবার এমনও কেহ কেহ বলেন যে ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগে অসভ্য বর্ব্বর অথবা অর্দ্ধসভ্য মাত্র ছিল। আমরা এ সকল বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে না যাইয়া ঐতিহাসিক যুগের কথা সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের বক্তব্য বলিব। যে সময়ের কথা সম্বন্ধে আমরা কথঞ্চিৎ নিঃসন্দেহ, তাহার উপরেই আমাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করা উচিত। ইউরোপ সম্বন্ধে একটু ভিন্ন কথা। কারণ, ইউরোপের জন্মকাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত জীবন-ইতিহাস এত তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে সন্দেহের বিষয় খুব কমই আছে। তাহা ছাড়া অতীতে কোন্ জিনিষ কি ছিল আমরা জানিতে চাই উহার বর্ত্তমান প্রকৃতিকে বুঝিবার জন্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের সম্বন্ধ খুব অল্পই। সম্বন্ধ কিছু থাকিলেও তাহা এত নীচে পড়িয়া গিয়াছে যে তাহার উদ্ধার সহজে সম্ভব নয়, কার্য্যতঃ তাহার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না।

বর্ত্তমান ভারত আরম্ভ বুদ্ধ হইতে। বস্তুতঃ বুদ্ধ ভারতবর্ষে এক যুগ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব কাল হইতে ভারতবর্ষ এক নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বুদ্ধ ভারতবর্ষকে যে দীক্ষা দিয়াছেন আজও ভারতবর্ষ সেই দীক্ষাতেই দীক্ষিত। সে দীক্ষার মূল কথা, জগতের অসত্যতা। জগৎ

ইউরোপের দান

অলীক, জীবন মোহময়, বাঁচিয়া থাকার মধ্যে কোন আনন্দ কোন মহত্ত্ব নাই এ কথা বুদ্ধ সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন। বুদ্ধ মহাশক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁহার ভাবটিকে ভারতের প্রাণে প্রাণে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আজকাল বৌদ্ধের সংখ্যা বেশী নয় কিন্তু তাহা নামে মাত্র, বস্তুতঃ সমস্ত ভারতবর্ষই বৌদ্ধ। কারণ যখনই যেখানে দেখি কোন ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, কোন ধর্ম্মসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই পাই এই প্রধান মন্ত্র—জগৎ হইতে সকল সম্পর্ক ছেদন কর। শঙ্কর রামানুজ নানক চৈতন্য, কি দ্বৈত কি অদ্বৈত কি বিশিষ্টাদ্বৈত সকলের মধ্যে এই এক ভাব, সকলেই পৃথিবীর ধূলিকে থুৎকার দিয়া চলিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসূত খ্রীষ্টধর্ম্ম, মূলতঃ এই সন্ন্যাস ধর্ম্ম—ইউরোপে কিন্তু এই সন্ন্যাসধর্ম্মের স্থান হয় নাই। আধুনিক ইউরোপ নামে খ্রীষ্টান, প্রকৃতপক্ষে সে গ্রীক ও রোমক-ভাবেরই ভাবুক। মর্ত্ত্যজগতের খেলাতে—জীবন ধারণের মধ্যে যে আনন্দরস বিচ্ছুরিত তাহার মূর্ত্তি গ্রীস ও রোম—আর ইহাই ইউরোপ। ইউরোপে যে প্রকৃত সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাস-সম্প্রদায় ছিল না তাহা নয়। খ্রীষ্টীয় চার্চ্চের প্রথম অবস্থায় প্রকৃত সন্ন্যাসী (monk, যথেষ্ট ছিল। আধুনিক সময়েও ইউরোপে টলষ্টয়ের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপের প্রাণ সেখানে নাই, সমস্ত ইউরোপ উহাকে আপনার জিনিষ করিয়া লইতে পারে নাই। ভারতবর্ষেও আধ্যাত্মিকতা ও আধিভৌতিকতার সম্মিলন-চেষ্টা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। রামদাস, গুরুগোবিন্দ

তাহার উদাহরণ। কিন্তু কর্ম্মাত্মক আধ্যাত্মিকতার ঢেউটি সন্ন্যাসের বিরাট্ সমুদ্রমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ রামদাস অথবা গুরুগোবিন্দকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার কোন চেষ্টাও করে নাই—শঙ্কর কিন্তু সহজেই ভারতীয় দীক্ষার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

ইউরোপের প্রথম দান জীবন, পৃথিবীর রসাস্বাদন,—বাঁচিয়া থাকিয়া শরীর ধারণ করিয়া যে কি আনন্দ তাহা ভোগ করা। আর, জগতের বস্তুকে ভোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে যে ভাবে তাহাকে আহরণ করিতে হয়, অধিকার করিতে হয়, সাজাইয়া গুছাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হয় তাহারও নিদর্শন ইউরোপ। এ জন্য যে অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্ম্মশীলতার মধ্যে যে অতুল আনন্দের প্রয়োজন তাহাও দেখাইয়াছে ইউরোপ। আবার অন্তরে যাহা, মনে যাহা, যাহা ভাবমাত্র তাহাকে যতক্ষণ বস্তুজগতে শরীরী করিয়া না তোলা হইতেছে, তাহাকে কার্য্যতঃ না প্রতিপাদন করা হইতেছে ততক্ষণ তাহার পূর্ণ সার্থকতা নাই এই তথ্যটিও ইউরোপেরই দান। কিছুদিন হইল ভারতে যে pragmatism-এর একটা ঢেউ অনুভব করিতেছি তাহা ইউরোপ হইতেই আসিয়াছে। কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের, অধ্যাত্মের সহিত অধিভূতের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে কিনা এ তর্কের শেষ নাই, দর্শনের কূট প্রশ্ন টানিয়া আনিয়া আমরা সে জটিল সমস্যা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব না। ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও যে জগতে থাকা যায়, ভগবানকে পাইয়াও যে জগতের সকল বিষয়ে লিপ্ত হওয়া যায়

এ কথা আমরা মানিয়াই লইয়াছি। আজকাল সর্ব্বত্রই এই প্রয়াসের উদাহরণ দেখিতে পাই, ইহাকে আমরা সত্য প্রয়াস বলিয়াই মনে করি। কোন বিতণ্ডার মধ্যে না যাইয়া বর্ত্তমান অনুসন্ধানসম্পর্কিত একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব।

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদী। অধ্যাত্মের উপরই আমাদের যাহা-কিছু সব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এ কথা অনেকেই বর্ত্তমান যুগে স্বীকার করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষ অধ্যাত্মকে ধরিয়া জগৎকে পায়ে ঠেলিয়াছে—কেন? ইহার এক সুন্দর ব্যাখ্যা পাই বুদ্ধেরই জীবনে। বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ভাব কিরূপে জাগরিত হইয়াছিল, জগতের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল কেন? রোগ জরা মৃত্যু দেখিয়া। রোগ জরা মৃত্যুর আবাসস্থল যাহা, সেখানে সুখের কি আছে, সেখানে থাকিয়া লাভ কি? জগতের সহিত প্রথম সংস্পর্শে আসিয়াই বুদ্ধের সম্মুখে পড়িল এই ভীতিত্রয়, ইহাদের দ্বারাই তিনি জগৎকে পূর্ণ করিলেন। জগতের আর কিছু তাঁহার চক্ষে পড়িল না। বৈরাগ্যের সাহিত্যে সর্ব্বত্র আমরা এই একই সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে শুনিতে পাই। শঙ্কর গাহিতেছেন, "অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং", ভর্তৃহরি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, "কণ্ঠাশ্লেষোপগূঢ়ং তদপি চ ন চিরং যৎ প্রিয়াভিঃ প্রণীতং।" জগতে যৌবন চিরকাল থাকে না, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় অবসাদ আসিয়া পড়ে, ধনদৌলত সকলই ফুরাইয়া যায়, মরণের পর জগতের কি থাকে? ততঃ কিম্? তবে জগৎ মায়া ছাড়া আর কি!

অতএব বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ বস্তু। জগতের সকল জিনিষ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া গিরিগহ্বরে পরমাত্মার ধ্যানে জীবনটি কাটাইয়া দেওয়াই সার জ্ঞান। কিন্তু বাস্তবিকই জগতে আর কিছু নাই কি? শুধুই রোগ, শুধুই জরা, শুধুই মৃত্যু, শুধুই ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্তি বা অতিতৃপ্তিজনিত অবসাদ? এমন কিছুই নাই কি যাহার জন্য জীবন বাস্তবিকই স্পৃহণীয়?

ভারতবর্ষ পরমার্থের ও জগতের মধ্যে মস্ত একটা ছেদের রেখা টানিয়া দিয়াছে। তাহার কারণ জগৎকে সে শুধু দেহ, শুধু স্থূল, ইন্দ্রিয়গত যাহা তাহার সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছে। ইউরোপকে আমরা জড়বাদী বলি কিন্তু বস্তুতঃ ভারতের বৈরাগ্যধর্ম্ম জড়বাদ বলিতে যাহা বুঝিয়াছে—শুধু স্থূল ইন্দ্রিয়ের জীবন—সেই অর্থে ইউরোপ জড়বাদী নয়। বরং ভারতীয় সাহিত্যে স্থূল ইন্দ্রিয়, শুধু শারীরিক বৃত্তির জীবনের কথা যতখানি পাই ইউরোপীয় সাহিত্যে তত পাই নাই। ভারতবর্ষ বুঝিয়াছে যদি আধ্যাত্মিক না হও তোমাকে একেবারে পশুতুল্যই হইতে হইবে—তৃতীয় পন্থা কিছু নাই। হয় উঠিয়া যাইতে হইবে পরমাত্মার অক্ষত, অব্রণ, শুদ্ধতার মধ্যে, নচেৎ শূকরের মত মূত্রপুরীষের মধ্যেই থাকিতে হইবে। ইউরোপ একথা স্বীকার করে নাই; ইউরোপ আধ্যাত্মিক নয়, কিন্তু শুধুই পশুসুলভ স্থূল জীবনের দাস, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে। ইউরোপের প্রতিভা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি জগৎকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাহা হইতেছে বুদ্ধির জগৎ, চিন্তার জগৎ, মেধার জগৎ, ভাবুকতার জগৎ। কাব্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান লইয়া ইউরোপ

ইউরোপের দান

যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে আমরা আধ্যাত্মিকতার ফল বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে রোগ-জরা-মৃত্যুর জগতেরই জিনিষ বলিয়া তুচ্ছ করিয়া দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। স্বীকার নয় করিলাম জগতে ইন্দ্রিয়-ভোগে সুখ নাই কিন্তু কেপ্‌লার যে রাত্রির পর রাত্রি আকাশের দিকে তাকাইয়া নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন তাহা কি ব্যর্থ গিয়াছে? হ্যাম্‌লেটের মত একটি চরিত্র গঠন করিয়া, ইলিয়ডের মত একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়া কি কোন অনাবিল সুখ নাই? কেপ্‌লার, সেক্সপীয়র, হোমর কেহই আধ্যাত্মিক বলিতে যাহা বুঝি তাহা কিছু ছিলেন না। তবুও জগতের মধ্যেও যে আনন্দ যে মহত্ত্ব রহিয়াছে তাহার রসাস্বাদন করিয়া তাহাতেই মগ্ন ছিলেন। জীবন তাঁহাদের যে মূল্যহীন এ কথা কে সাহস করিয়া বলিবে?

ইউরোপের ইহাই মহৎ দান। চিন্তার খেলা, বুদ্ধির খেলা, জানিবার, বুঝিবার, ভাবিবার—তৃপ্তিহীন ঔৎসুক্য। ভারতবর্ষে যে কখন কোথাও এ ভাব ছিল না সে কথা আমরা বলি না। গুপ্তদিগের সময়ে, চেরা চোলদিগের সময়ে আমরা এই মানসিক বৃত্তির উজ্জ্বল খেলা দেখিয়াছি। কিন্তু উহা ঠিক ইউরোপের মত নহে। সারা ইউরোপের সমস্ত জীবন সমস্ত দীক্ষাই এই ভাবে কেন্দ্রীভূত। ভারতে এখানে ওখানে এ যুগে ও যুগে কতিপয় গুণী লোকের মধ্যে উহা আবদ্ধ ছিল। গোটা ভারতবর্ষের চক্ষে ইহা তেমন মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হয় নাই। সেক্সপীয়রের নাটক শিক্ষিত অশিক্ষিত, আবালবৃদ্ধবনিতাকে আনন্দ দিয়াছে—

কালিদাস শকুন্তলা রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু "অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ" বিদ্বৎসমাজের জন্য। সকল জিনিষকেই জানিবার—বুঝিবার অসীম কৌতূহল, নূতন জিনিষ ভাবিবার, উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস ভারতবর্ষে খুব কম। ইউরোপ নিত্য নূতন জ্ঞান, নূতন তথ্য চাহিতেছে। আজ একটাকে সত্য বলিতেছে, কাল তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি কথাকে সত্য বলিতেছে, পরশ্ব দিন আবার সম্পূর্ণ নূতন এক সত্য বাহির করিতেছে। ভারতবর্ষ ইহাকে শফরীসুলভ চঞ্চলতা বলিবে কিন্তু ইহার মধ্যে চিন্তা-বৃত্তির, মস্তিষ্কের যে একটা সজাগ ভাব রহিয়াছে ভারত তাহার সন্ধান পায় না। ভারতবর্ষের প্রাণ যেন বলিতেছে, জানিবার কি আছে, ভগবানই একমাত্র জ্ঞাতব্য, তাঁহারই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, ধ্যান করিয়া তাহাতেই মগ্ন হও—অন্য বাচো বিমুঞ্চথ। ফলে কিন্তু সে ভগবানকেও ধ্যান করিতে পারে নাই। জীবন-সম্পর্কশূন্য হইয়া সে ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে—মুখে ভগবানের নাম করিয়াছে, সকল ব্যাপারে ভগবানের দোহাই দিয়াছে কিন্তু সে সজীব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইউরোপের মত জড়বাদী না হইয়াও ভারতবর্ষ ইউরোপের অপেক্ষা অধিক জড় হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপে তাই দেখি নিত্য নূতন আবিষ্কার কিন্তু ভারতবর্ষে শঙ্কর, বাদরায়ণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহারই টীকা অনুটীকা কেবল চলিয়াছে। নূতন কথা ইউরোপ সাগ্রহে আদর করিয়া লয়, তাহা যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন—ভারতবর্ষে পুরাতন চিরপরিচিত কথা না বলিলে, শাস্ত্রের

উল্লেখ না করিলে কেহ বুঝে না। ইউরোপ যে অবিচ্ছিন্নধারে তাহার উৎস স্থান গ্রীস হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত আপন ভাবটি বহিয়া আনিয়াছে এ কথা আমরা বলি না। রোমক আধিপত্যের কিয়দংশ, মধ্যযুগের কিছু কাল সে ইহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তবুও তাহার সমস্ত ইতিহাসটি একযোগে দেখিলে এই ভাবটিই শীর্ষদেশে উজ্জ্বলবর্ণে লিখিত দেখিতে পাই।

ইউরোপের এই জ্ঞান-তৃষ্ণাকে জড়বাদের সহিত না মিশাইয়া ইহাকে ভাবুকতা নামেই আমরা অভিহিত করিতে চাই। কারণ, ভারতবর্ষ যেমন ভগবানের ভাবে মত্ত, ইউরোপ তেমনই জগৎবস্তুর, জগৎঘটনার ভাবে মগ্ন। সাধারণ রূপে লইলে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল কিছু প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না। ধর্ম্মকথা ভগবৎ-প্রসঙ্গে ডুবিয়া ভারতবাসী যেমন জীবন স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতে পারে, ইউরোপবাসী তেমনই কাব্যালোচনা করিয়া, রাষ্ট্র-নীতিক কোন সমস্যা বিচার করিয়া আনন্দে জীবন কাটাইতে পারে। ধর্ম্মকথা শুনিয়া, ভগবৎবিষয় আলোচনা করিয়াই কাহারও মুক্তি হয় না। আবার ভগবানকে না ভাবিয়া জগৎবিষয়ের কোন কিছু কথা ভাবিলেই যে নরকগামী হইতে হয় এমনও নয়। বস্তুতঃ প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা জিনিষটি মনের এই সহজ ভাবুকতা অপেক্ষা আরও কিছু বৃহত্তর, মহত্তর ও কষ্টকর বস্তু। স্বীকার করি ভারতবর্ষের ভাবুকতা ভগবৎমুখী আর সেইজন্য আধ্যাত্মিকতার উহা উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। কিন্তু ইউরোপের ভাবুকতার সহিত এই আধ্যাত্মিকতার যে কোন বিরোধ আছেই তাহা আমরা মনে করিতে পারি না।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি পাশ্চাত্যের তথাকথিত জড়বাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া কি সুমহান্ ফল প্রসব করিতে পারে তাহার কিছু নিদর্শন পাই আমাদের জগদীশচন্দ্র বসুর মধ্যে। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে যে ভাবে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যকর। তিনি দেখাইয়াছেন জগতের অতীত হইয়া নয়, জগতের মধ্যে রহিয়া, জগতের নগণ্য স্থূল জিনিষের জীবন-খেলা-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া আমরা স্থূলের মধ্যে আধ্যাত্মিক তথ্য, নিয়মপ্রণালী কি ভাবে কার্য্য করে তাহারই উদাহরণ পাই। কারণ, আধ্যাত্মিক অর্থ শুধু আত্মার স্বরূপে ডুবিয়া থাকা নয়, রূপের মধ্যে, প্রকাশের মধ্যে সেই আত্মা কি ভাবে বিকশিত, কি ভাবে কর্ম্মপর তাহা দেখা, বুঝা, অনুভব করাও আধ্যাত্মিকতা। জগদীশচন্দ্র যখন বলিলেন জড়ে, উদ্ভিদে, জীবে একই প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে তখন তিনি ভারতের আধ্যাত্মিকতারই প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু তাঁহার নূতনত্ব, তাঁহার মহত্ত্ব এই তত্ত্বটি ঘোষণা করিয়া নয়। যখন তিনি এই তত্ত্বটি স্থূলে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন তখন কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিকতার সহিত ইউরোপের বাস্তবিকতা এক সূত্রে মিলাইয়া দিলেন। স্থূল দৃষ্টির সাহায্যে ঋষিদৃষ্টিকে ব্যাখ্যা দিয়া সপ্রমাণিত করিয়াই তাঁহার নূতনত্ব, মহত্ত্ব।

কর্ম্মের জগৎ, এমন কি চিন্তার জগতেরও উপরে যে আত্মার, পরমার্থের জগৎ আছে ইউরোপ তাহাকে ভারতবর্ষের মত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারে নাই। ইহাই ইউরোপের মস্ত

অভাব। আর এই জন্য যদি উহাকে জড়বাদী বলিতে চাই তবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কিন্তু এই চিন্তার জগৎ, এই কর্ম্মের জগৎ বিশেষরূপে ইউরোপেরই দান। আধ্যাত্মিক হইতে হইলে এই সব ত্যাগ করিতে হইবে বা ইহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইতে হইবে এমন নয়। আর জগৎবিষয়ক চিন্তার সহিত স্থূল জীবনের কর্ম্মের সহিত আধ্যাত্মকতার যদি একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারি তবে ইউরোপ ভোগ ঐশ্বর্য্য ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যেও যে আনন্দ মহত্ত্ব পাইয়াছে তাহার সহিতও আধ্যাত্মিক জীবনের একটা মিলন সাধন করা যাইতে পারে ইহা অসম্ভব কল্পনা কিছু নয়।

মহাযুদ্ধের শিক্ষা

যুদ্ধ থামিয়াছে। এত বড় যে একটা প্রলয়কাণ্ড, ইতিহাসে যাহার তুলনা পাই না, তাহার শেষ হইল। কিন্তু ইহা হইতে শিখিলাম কি? কোন্ সত্য আগুনের রঙে আমাদের প্রাণে দাগ কাটিয়া দিয়া গেল, আমাদের দৃষ্টির পর্দ্দা ছিঁড়িয়া কোন্ নূতন ভাব বাহিরে ছুটিয়া আসিল?

সকলের আগে শিখিলাম অদৃশ্য এক শক্তির অস্তিত্ব। জানিলাম তোমার আমার শক্তি কিছুই নয়, জর্ম্মণশক্তি বলিয়া কিছু নাই, ইংরাজ বা ফরাসী বা মার্কিণশক্তি বলিয়া কিছু নাই। সকল শক্তিই আর-এক শক্তির হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা। মানববুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই, কেহ বিচার করিয়া মাথা খাটাইয়া যাহা ভাবিতেছে সে করিবে বা যাহা হইবে তাহা ঠিক সে করে না, তাহা হয় না। আর-একজনের তপঃদৃষ্টি তোমার আমার সকল গণনা সকল প্রয়াস কোথাও এতটুকু আশ্রয় করিয়া মাত্র, বেশীর ভাগই বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া আপনার লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে। জর্ম্মণীর মহাশক্তি তাসের ঘরের মত কোথায় এক মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল, জর্ম্মণী সে আশঙ্কা কখন করে নাই, ইংরাজও সে ভরসা

করে নাই। ইংরাজের প্রতাপ এমন বিপুল বিরাট হইয়া উঠিবে, ইংরাজের শত্রু তাহা ভাবিতেও পারে নাই, ইংরাজ নিজেও তাহা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই। যুদ্ধ যে এমনভাবে শেষ হইবে কোন্ রাজনীতিক তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন? এ কি অঘটন নয়? বলিবে, মিত্রশক্তিসঙ্ঘের ছিল বুদ্ধিবল, শক্তিবল—তাই তাঁহাদের জয় হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কিন্তু জর্ম্মণীর বুদ্ধি ছিল না, শক্তি ছিল না? সে বুদ্ধি সে শক্তি লইয়া জর্ম্মণী কি করিল? তোমরাই না দুই দিন আগে জর্ম্মণীর বুদ্ধি, জর্ম্মণীর শক্তি দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলে? তবে কেন এমন হইল? আমরা বলি সেনাপতি ফোকের কৌশল আর আমেরিকার সৈন্য ও দ্রব্যসম্ভার হইতেছে ছুতামাত্র, এ সকল আর-একজনের হাতের যন্ত্র। বিচার বুদ্ধি আর বাহুবলই যদি জয়ের নিয়ন্তা হইত তবে সেই যুদ্ধের প্রারম্ভেই প্যারীনগরীর একেবারে উপকণ্ঠ হইতে জর্ম্মণী মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত না—যুদ্ধ বহুদিন পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যাইত। আমরা বলি, তুমি তোমার পথে চলিতেছে না, আমিও আমার পথে চলিতেছি না, আমরা দুইজনেই চলিয়াছি মুরারীর তৃতীয় পন্থায়। ইহাকেই বলি অঘটন, ইহাকেই বলি miracle—নূতন শক্তির আবির্ভাব। মানি, সকল শক্তির যদি হিসাব রাখিতে পার, হাতের মুঠিতে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পার তবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে পার, সকল ভবিষ্যৎকে তোমার নখ দর্পণে বাঁধিতে পার। কিন্তু কথা এই, তুমি তাহা পার না, আমিও পারি না,

সেটি মানুষী বুদ্ধির কাজ নয়। পারেন যিনি তিনি মানুষ নহেন, তিনিই ভগবান। জগতে কত শক্তি আছে, এই শক্তিরাজী স্তরে স্তরে সাজান, কতক গুপ্ত কতক ব্যক্ত—ব্যক্ত যাহা তাহারই একটা অংশ এই স্থূল জগতের ঘটনা পরম্পরাকে সাক্ষাৎভাবে চালাইয়া লইয়াছে, এই অংশেরও একটি ভাসাভাসা অংশ মানুষের বুদ্ধিতে, মানুষের অহঙ্কারমিশ্রিত চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত। শক্তির যে মূল, কেন্দ্র, উৎস—dynamo—তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেখান হইতেই শক্তির শতধারা বহিয়া আসিতেছে—এই ধারা আবার সমানভাবে একই পদ্ধতি ধরিয়া চলে না, dynamo ঘুরিতেছে আর প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন শক্তিকে জন্ম দিতেছে, dynamoর জোর আবার কখন কখন বাড়িয়া যায় শক্তিও তাই উপছাইয়া চলে, পদ্ধতিকে ভাঙ্গিয়া, গতানুগতিককে উল্টাইয়া মানববুদ্ধিকে বিমূঢ় করিয়া নূতন কিছু করিয়া চলে। জগতে এই মহাপ্রলয়ে আজ দেখিলাম এই রকম এক নূতন অভূতপূর্ব্ব অদৃশ্যপূর্ব্ব এক মহাশক্তির আবেগ।

দ্বিতীয় শিখিলাম জগতের মধ্যে প্রলয়ের সম্ভাবনা। আমাদের সহজবুদ্ধির ধারণা এই জগৎ চলে ধীরে মন্থরগতিতে, ধাপের পর ধাপ আস্তে আস্তে পার হইয়া। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম হইতেছে ক্রমবিবর্ত্তন evolution অর্থাৎ পা টিপিয়া চলা। কোন একটা বিপুল আকস্মিক পরিবর্ত্তন যেন প্রকৃতির ধাতুতে নাই—Revolution হইতেছে প্রকৃতির অধর্ম্ম। এমন কি, এ ধারণাও আমাদের অন্তরে বেশ লুকাইয়া আছে যে বিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তনও

বোধ হয় কিছু নাই। সূর্য্য আজ যেমন উঠিতেছে ডুবিয়া যাইতেছে, চিরকাল তেমনি উঠিয়াছে ডুবিয়াছে, চিরকাল তেমন উঠিবে ডুবিবে। গোলাপ ফুলটি যুগের পর যুগ একই ভাবে ফুটিতেছে, ঝরিতেছে। মান্ধাতার সময়ে মানুষ যে রকমে প্রেম করিত, আজও সে সেইভাবেই করিতেছে। মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না অভাব অভিযোগ আশা ভরসা তথাকথিত সত্যযুগেও যেমন, এই ঘোর কলিযুগেও ঠিক তেমনি। জগৎটা অতি পরিচিত, অতি পুরাতন সুতরাং vanity of vanities! সাহিত্যে ইতিহাসে আমরা যতই পড়ি না কেন, আমাদের নিজেদেরও স্বপ্নে কল্পনার যতই আকাশ-কুসুম দেখি না কেন, তবুও বিশ্বাস হয় না, শ্রদ্ধা হয় না, অন্তরে কোনও এক অবিশ্বাসী সবজান্তা পুরুষ বসিয়া বসিয়া হাসিতেছে আর টিট্‌কারী দিতেছে। কিন্তু আজ সে জীবটির সুলভ হাসি কাষ্ঠহাসিতে কি পরিণত হইতে চলে নাই? আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া কে দেখাইয়া দিল যে জগতে নূতনও সম্ভব হয়, জগৎ যে গড্ডলিকা প্রবাহেই চলে তাহা নয়, সেখানে বিপুল তোলপাড়, যাহাকে সম্ভব মনে করিতেও ভয় হয়, এমন জিনিষও ঘটে? আর আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি যে জগতের গতি, সৃষ্টির বিবর্ত্তন কেবল মন্থর শ্লথ নয়—এমন সময়ও আসিয়া থাকে যখন তাহা অধীর ব্যস্ত হইয়া উঠে, যুগের যুগের কাজ যখন সে এক মুহূর্ত্তেই শেষ করিয়া ফেলে।

ফলতঃ প্রলয় বিবর্ত্তনের এক অব্যর্থ অঙ্গ। প্রলয় ব্যতিরেকে জগতের গতি নাই, উন্নতি নাই। ধীরে চলা যখন সৃষ্টির অভ্যাস

হইয়া গিয়াছে, ধীরে চলা হইতে যখন সে বসিয়াই পড়িতে চায়, ঘোর তামসিকতা যখন মানুষকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিতেছে, পুরাতন যখন অচল কঠিন নিরেট হইয়া পড়িয়াছে, বাহিরের খোলস এত স্থূল হইয়া উঠিয়াছে যে. ভিতরের মনের চলাচল প্রায় বন্ধ তখনই কালপুরুষ, প্রকৃতির অন্তর্যামী শক্তি রুদ্রমূর্ত্তি লইয়া অবতীর্ণ হন, সকল বাধা সকল বাঁধ ঠেলিয়া ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া ছুটিয়া চলেন। ধর্ম্ম যখন জড়বস্তু, পাপের ভারে পৃথিবী যখন ক্লিষ্ট তখনই বাসুকী মাথা ঝাঁকিয়া উঠেন, তখনই প্রকট হয় কালীর তাণ্ডব নৃত্য, পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য, নূতনের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য—পরিত্রাণায় সাধুণাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং—আবির্ভূত হয় ধুমকেতুমিব কিমপিকরাল মহাশক্তি। সে শক্তির কাছে দেশ কাল পাত্রের প্রতিবন্ধক নাই। চোখের নিমেষেই সে শক্তি দূরকে নিকটে, স্বপ্নকে জাগ্রত সত্যে পরিণত করে। মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিং।

আর শিখিলাম অসুর যে অহংকারী যে অত্যাচারী যে, নিজের ধ্বংসকেই সে কেমন নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে। যে যত বড় অসুর তাহার ধ্বংস ততই অনিবার্য্য ততই আশু। অথবা যে-অসুরকে ভগবান ধ্বংস করিতে চাহেন, যে শক্তি সৃষ্টির উন্নতির অন্তরায় সে শক্তিকে আমূল বিনাশ করিবার জন্যই যেন এক মহাশক্তি এমন বিপুল দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলেন—তাহাকে নির্ব্বংশ করিবার জন্যই যেন রুদ্রদেব তাহাকে রক্তবীজ করিয়া তুলেন। যাহার মাথা যত উঁচু তাহার পতন ততই সম্ভব, আপনার ভারেই

সে আপনি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধুলিসাৎ হয়—সে যখন একবার পড়ে তখন পুনরুত্থানের কোন সম্ভাবনাই তাহার থাকে না। কৌরবের কেন অতি মান হইয়াছিল, লঙ্কেশ্বরের কেন অতি দর্প হইয়াছিল? জর্ম্মণীর এমন আত্মম্ভরিতা কেন হইয়াছিল? অদৃশ্যশক্তি তাই আমাদিগকে আজ ডাকিয়া বলিতেছেন—সাবধান! বাহিরের ঠাট, অস্থকার বিজয় দেখিয়া মত্ত হইও না; সকলের আগে দেখ কোন্ শক্তি তোমার মধ্যে কার্য্য করিতেছে, কোন্ পক্ষে তুমি—দেবপক্ষে না অসুরপক্ষে?

আজ শিখিলাম বর্ত্তমানে ক্ষুদ্র হই, নগণ্য হই অধঃপতিত হই—তাহাতে নিরাশ হইবার কিছু নাই কিন্তু থাকি যদি দেবতার ধর্ম্ম লইয়া—স্বল্পমপি অস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। কারণ অসুরের ধর্ম্ম হইতেছে সমস্তের বিরুদ্ধে একের, অসীমের বিরুদ্ধে খণ্ডের ধর্ম্ম। অসুরের ধর্ম্ম হইতেছে জগৎধর্ম্মের প্রতিকূল ধর্ম্ম—প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের অভাব মাত্র; কারণ, অসুরের ধর্ম্ম জগৎকে ধারণ করে না, সৃষ্টির মহাশৃঙ্খলাকে অটুট অব্যাহত রাখিয়া ফলাইয়া তুলে না, বহুকে যুক্ত একপ্রাণ করিয়া ধরে না। তাহার প্রয়াস ভাঙ্গিয়া ফেলা বিশৃঙ্খলাকে ডাকিয়া আনা। অসুর তাহার অসুরত্ব বজায় রাখিবার জন্য চায় দাস অর্থাৎ যাহার উপর অকাতরে সে আপন প্রতাপ দেখাইতে পারে, যে পদতলে থাকিয়া আপন কপালের ঘাম হৃদয়ের রক্ত দিয়া তাহারই মহিমাকে ওজঃপূর্ণ উজ্জ্বল করিয়া ধরিবে। কিন্তু আজ দেখিলাম দাসের, উৎপীড়িতের পতিতের মধ্যেও কি ভাগবত শক্তি লুকাইয়া আছে,

অণুর মধ্যে আছে এক মহান্, মাথার উপরে পর্ব্বতপ্রমাণ ভারকেও সে উল্টাইয়া ফেলিতে পারে, আপনার স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। জগৎ একটিমাত্র বিশেষ আশ্রয়কে ধরিয়া চলিতেছে না, তাহার আছে বহু কেন্দ্র, প্রত্যেক কেন্দ্রের মধ্যেই অনন্তশক্তি নিহিত—যে কেন্দ্র অতিকায় হইতে চলে সে ফলতঃ চায় অন্যের শক্তি চুরি করিতে অথবা ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে ধারণ করিতে, ফলে হস্তীর মত বিপুলকায় হইতে চাহিয়াছিল যে-ভেকপ্রবর তাহারই মতন সে ফাটিয়া পড়ে।

অসুর হইতে যে চাহি না সে কেবল ফলের দিক দিয়াও নয়। অসুর যে, সুধু অসুরত্বে তাহার নিজেরও সার্থকতা নাই—অসুরেরও যে আত্মা আছে তাহার বিফলতা এই অসুরত্বেই। অসুরকেও অসুরত্ব কাটাইয়া উঠিতে হইবে—তবেই হইবে তাহার নিজের অন্তরাত্মার সে অন্তরতম গভীরতম তৃপ্তি পরিপূর্ণতা। জর্ম্মণীর যে অসুরত্বের দিক, অর্থাৎ প্রুশিয়ার প্রভাব, ট্রাইটস্ক, বের্ণহার্ডি বা জিঙ্গোদিগের শিক্ষা সেটা জর্ম্মণীর যতই প্রাণের জিনিষ হউক না কেন, তাহারও নীচে আছে জর্ম্মণীর প্রকৃত জর্ম্মণত্ব। সেটি জর্ম্মণের মধ্যে ভাগবত ইচ্ছা, দেবভাব—তাহার ছায়া কিছু পাই কাণ্টের মধ্যে, গ্যেতে'র মধ্যে—সেই দেবভাবকে, আপন ভগবানকে যতদিন জর্ম্মণী পাইতেছে না ততদিন অসুরভাব লইয়া সে ভুলপথে, মিথ্যার দিকেই চলিয়াছে। অসুরের ধর্ম্ম অসুরের পক্ষেও চিরদিনই পরধর্ম্ম। তাই জগৎ আজ তাহার শত কাইজারকে অবহেলে মাথার উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে।

অসুরের ধ্বংস হইবে। কিন্তু যে অসুর আসুরিক ভাব ও মূর্ত্তি লইয়া আসে সেই একমাত্র অসুর নয়। দেবভাব লইয়াও অসুর দেখা দেয়, দেবতার চক্ষে ধূলি দিবার জন্য, আপনাকে আপনি ভুলাইবার জন্য। বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে দেবভাব, অসুরভাব দুইই আছে। সম্মুখ যুদ্ধে অসুর যখন পরাস্ত হয় তখন সে আক্রমণ করে পশ্চাৎদিক হইতে। মানুষের মধ্যে দেবভাব এখনও ভাবলোকে, অসুরভাবই হইতেছে প্রকাশে বাস্তবে —এই অসুরভাবের দিকেই তাহার সত্তার কেন্দ্রভার ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমি, আমার, আমার জন্য—এই বোধ এই আবেগই তাহার মধ্যে জাগ্রত। এই বোধ এই আবেগ অতি স্থূল অতি প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, জর্ম্মণী অজ্ঞানে তাহার চরিতার্থতায় ছুটিয়াছিল, তাই প্রকৃতি তাঁহার ভীষণ লগুড়াবাতে বুঝাইয়া দিলেন—'না, আমার এ নিয়ম এ উদ্দেশ্য নয়—তোমারও এ লক্ষ্য, এ পথ নয়'। ভোগের দ্রব্যসম্ভার সম্মুখ হইতেই কাড়িয়া লইয়া কালী অট্টহাসে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কর ভোগ এখন!" জগৎ তাই আজ বলিতেছে "আমি নয়, আমার জন্য নয়"। কিন্তু বাহিরের ঠাট না থাকিলে কি হইবে, ভিতরে যে ভরপুর ক্ষুধা আছে—তবুও মন খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না, যে শিক্ষা এখনই পাইল তাহা এত শীঘ্রই ভুলিতে পারিতেছে না, তাই আপনাকে ঢাকিয়া লুকাইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিতেছে "তুমি তোমারই বটে— তবে আমিও আছি, আমি আছি তোমারই জন্যে—তোমার কিছু ভাবিতে দেখিতে হইবে না, আমিই সব দেখিব"—একথা হইতে

"তুমি আমার জন্ত" একপদমাত্র। এই রকমে পরাহত অসুর দেবতার মুখোস পরিয়া দেখা দেয়। তখন আবার আর এক বিপ্লব, আর এক প্রলয়ের সূচনা।

ইহার দ্বারা প্রকৃতি—অথবা অদৃশ্যশক্তি বা ভগবান—মানুষকে বুঝাইয়া দিতেছেন গীতার সেই কথা—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য যে আস্তে মনসা স্মরন্—ভোগের বস্তু, এমনি ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়কেও সংযম করিলে হয় না, চাই মনকে সংযম করা। ভিতরের যতদিন পরিবর্ত্তন হইতেছে না বাহিরের পরিবর্ত্তন ততদিন সত্য খাঁটি হইয়া উঠিবে না। মনে যতদিন ভোগস্মৃতির ঢেউ খেলিতেছে, সে ঢেউ শরীরের তটে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িবেই, অন্তরে যতদিন বীজ রহিয়াছে বাহিরে সে একদিন না একদিন, একভাবে না আর-একভাবে মহীরুহ হইয়া উঠিবেই। ভিতরের বাসনা চিরদিনই আপনার অনুযায়ী মালমশলা বাহিরে গড়িয়া লইবেই।

ইউরোপে আজ ইহাই দেখিতেছি। ইউরোপ অতিমাত্র স্থূল তাই প্রথমে স্থূলেই আঘাত পড়িয়াছে। মূর্খের মতন পশুরও হইতেছে একমাত্র লাঠ্যৌষধ। আত্মহারা যে, ভোগে মাৎসর্য্যে যে অতিমাত্র মত্ত, আসুরী বা রাক্ষসী বৃত্তি ছাড়া বাহির ছাড়া যাহার অন্য কোন জিনিষের চেতনা নাই, থাকিলেও অতি ক্ষীণ অতি দুর্ব্বল—তাহাকে সচেতন করিতে হইলে চাই প্রথমে এই বাহিরের উপর আঘাত। ঔদরিক যে তাহাকে শিক্ষা দিবার প্রথম পন্থা হইতেছে ভোজনের পাত্র তাহার সম্মুখ হইতে বার বার কাড়িয়া লওয়া, প্রাণে এই রকমে দাগ কষিয়া দেওয়া তারপর

মনের, ভাবের দিক হইতে যে চেষ্টা হইবে তাহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে। ইউরোপের সমস্ত প্রাণ যে জিনিষের উপর পড়িয়াছিল—স্থূলের উপর, ইহের উপর অটুট আস্থা, রুদ্রদেব ঠিক সেইখানেই সর্ব্বাগ্রে আগুন জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রাণকে এমন ভাবে আলোড়িত করিয়া দিয়াছেন যে সেখানে নূতন কিছু বীজ পড়িবার অবকাশ এখন পাইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তাহার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

কিন্তু আমরা যেমন বলিতেছিলাম, অসুরের আসুরিক দেহ গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে কিন্তু আসুরিক প্রাণ এখনও তাহার আছে। সে প্রাণ শিথিল টলমল হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার এখনও যথেষ্ট শক্তি আছে। সে শক্তি একত্র করিয়া সংহত করিয়া আবার সে এক নূতন দেহ গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবে। সে শক্তির সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকেও পরাহত করিবে—এমন শক্তি চাই, আসিবেও। জগতের রাজসিক ভাব ক্ষয় করিবার ভার ইউরোপ লইয়াছে—তাই ইউরোপে দেখি রাজসিক ভাবের এমন অতিমাত্রা। এই যে ইউরোপে প্রলয় গেল তাহা হইতেছে রাজসিক ভাবের উপর রাজসিক ভাবের প্রতিক্রিয়া, হিরণ্যকশিপুর জন্য নৃসিংহের আবির্ভাব কিন্তু বিষের দ্বারা বিষের কুফলকে নষ্ট করা হইলেও, আধারের উপর সে বিষের প্রভাব কিছু থাকিয়া যায়ই। এটুকুও বিদূরিত করিতে হইলে চাই আর এক রকম জিনিষ—বিষকে যে নির্ব্বিষ করে তাহা নয় কিন্তু তাহাকে অমৃতই করিয়া ধরে। তখন প্রয়োজন এমন শক্তি যাহা রাজসিক নহে, কিন্তু যাহা রজঃকে

আত্মসাৎ করিয়া শুদ্ধতর মহত্তর, আরও শক্তিমান কিছু হইয়া উঠিয়াছে। দেবতা হইয়া গিয়াছে যে অসুর, শুদ্ধসত্ত্বে পরিণত হইয়া গিয়াছে যে রজঃ। নৃসিংহ বা পরশুরাম নহে, তখন চাই শ্রীরামচন্দ্র।

ইহাই হইতেছে অধ্যাত্মশক্তি—অন্তরাত্মার ভাগবত শক্তি। ইউরোপে এই শক্তি ফুটিয়া যে উঠিবে তাহা খুবই অসম্ভব বোধ হয়—ইউরোপের যদি সে বীজ থাকিত তবে এভাবে সে গড়িয়া উঠিত না, এ রকম পথে প্রকৃতি তাহাকে চালাইয়া লইত না। ফলতঃ সে জিনিষটি আসিতেছে দেখি অন্যত্র হইতে। আমেরিকা যে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে শেষে প্রধান স্থান লইয়াছিল তাহার কারণও এই। আমেরিকার অফুরন্ত লোকবল অর্থবল গৌণ কারণমাত্র—মুখ্য কারণ আমেরিকা দিয়াছিল, অন্ততঃ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল এই অধ্যাত্মশক্তির কিছু। কিন্তু আমেরিকা ইউরোপেরই অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমেরিকার যে অধ্যাত্মশক্তি সেটী বেশীর ভাগ হইতেছে ভাবগত, কল্পনাগত, কবি কল্পনার মত। আমেরিকা সে অধ্যাত্মশক্তিকে উপলব্ধি করে নাই, তাহাতে ভরাট হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার মধ্যে সে অনাহত বাণী গর্জ্জিয়া উঠিতে পারে নাই, আমাদের প্রাচীন ঋষির কথায়—বেদাহম্ এতৎ পুরুষম্ আদিত্যবর্ণম্।

এ শক্তি হইতেছে প্রাচ্যের, এসিয়ার—ভারতবর্ষের। ক্ষাত্রশক্তি যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, যে শক্তি জগৎকে অমৃতময় করিয়া তুলিবে তাহা ক্ষাত্রশক্তি নয়। এই ক্ষাত্রশক্তির সম্মুখে

যে দাঁড়াইতে পারিবে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুড়াইয়া নূতন তেজে নূতন রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে তাহা হইতেছে একমাত্র ভারতের অধ্যাত্মশক্তি। সেই ভারত যে একদিন বলিতে পারিয়াছিল—ধিক্ ক্ষাত্রবল, ব্রহ্মবলই একমাত্র বল. সেই দেবোপম ভারতশক্তিই জগতের প্রকৃত নবজীবন দিবে। ইউরোপ জগৎকে যে নবীন মূর্ত্তি দিতে চাহিতেছে, কঠোর শিক্ষার ফলে যে একটা নূতন বিধান নূতন সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চলিয়াছে—পুরাতন অপেক্ষা একটা গভীরতর মহত্তর স্থায়ী সংহতির মধ্যে মানবসম্প্রদায়কে জাতিসকলকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছে তাহা বিশেষ ফলদায়ী হইবে এমন চিহ্ন কিছু পাই না—বরং বিপরীত চিহ্নই পাইতেছি। কারণ, ইউরোপ কাঠামটা দিতে চাহিতেছে ধর্ম্মরাজ্যের কিন্তু প্রতিষ্ঠায় রাখিয়াছে সেই প্রাচীন ক্ষাত্রশক্তি। ইউরোপ জোর দিতেছে দেহের যন্ত্রের উপর কিন্তু প্রাণের খোঁজ সে পায় নাই—খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছিল বোধ হয় কিন্তু স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে। এ শিক্ষারও প্রয়োজন ছিল—ইউরোপ চিনিবে ভারতবর্ষকে, পাশ্চাত্য চিনিবে প্রাচ্যকে, পৃথিবী আসিয়া স্বর্গকে আলিঙ্গন করিবে, দেহ পাইবে তাহার ভাগবত সত্তা—নতুবা পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই, মানবের পূর্ণ বিকাশ নাই।

এই অধ্যাত্ম বিজয়ের জন্য ভারত তুমি প্রস্তুত হও—যুদ্ধের এই শেষ শিক্ষা। হে ভারতশক্তির সাধকবৃন্দ, তোমাদের দিন আসিয়াছে, নিজের গৃহ হইতে গিরিগহ্বর হইতে তোমাদিগকে বাহিরে আজ আসিতে হইবে, জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে।

যে প্রলয়টি হইয়া গেল তাহা হইতেছে বিশেষভাবে স্থূলেরই প্রলয়, তাহাতে সূক্ষ্মেরও এক স্তর ধ্বসিয়া পড়িয়াছে বটে কিন্তু সেই সূক্ষ্মের আর একটি প্রলয় ব্যাপার ইহাতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সাথেও স্থূল জগতে স্থূলভূতে যে লণ্ডভণ্ড হইবে না, তাহা নয়—হইবে, বপুল আমুল পরিবর্ত্তন। কিন্তু তাহার স্বরূপ তাহার প্রকৃতি অন্য রকমের। আজ আসুরিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই দেবশক্তি জয়লাভ করিয়াছে। কাল কিন্তু দেবশক্তি দিব্যশক্তির সহায়ে জয়ী হইবে। কোথায় কোন্ সাধক আজ দিব্যশক্তির সাধনা করিতেছে—প্রকট হও তুমি তোমার হিরণ্ময় মূর্ত্তিতে, তোমার হিরণ্ময় বর্ম্মে হিরণ্ময় আয়ুধে, তোমার হিরণ্ময় রথখানিতে।

স্বরাজ ও স্বারাজ্য

দেশে আগে কথাটা ছিল 'স্বারাজ্য', আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় প্রয়োজনচক্রে তাহা দাঁড়াইয়াছে 'স্বরাজ'। স্বারাজ্য ছিল অন্তরের একটা রূপান্তর, মানুষের স্বভাবের একটা শুদ্ধি ও ঋদ্ধি; স্বরাজ হইতেছে বাহিরের একটা রূপ-গঠন, মানুষের একটা কর্ম্মক্ষেত্রের পরিশোধন সম্প্রসারণ শৃঙ্খলাবিন্যাস। তারপর স্বারাজ্য ছিল ব্যষ্টিগত একটা সিদ্ধি, স্বরাজ কিন্তু হইতেছে সমষ্টিগত একটা সিদ্ধি।

আধুনিক যুগের বিশেষত্ব, তাহার দান হইতেছে ঠিক এই দুইটি জিনিষ—প্রথম, বাহিরের জগতের জীবনের উপর টান, মাটির পৃথিবীর রসে শক্তিতে জ্ঞানে ভরপুর হইয়া উঠা; আর দ্বিতীয়, এই জ্ঞান এই শক্তি এই আনন্দ হওয়া চাই সকলের সমবেত জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ, এ জিনিষটি কেবল পৃথক পৃথক ভাবে এখানে ওখানে দুই চারিজনের সম্পত্তি হইলে চলিবে না। সমষ্টি আর বাহির, এই দুইএর মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সমষ্টি যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে তাহার অর্থ ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধ—দান প্রতিদান, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া—তাহার অর্থ

কর্ম্মক্ষেত্র। ফলতঃ সমষ্টির স্বাভাবিক সাধনা হইতেছে কর্ম্মের সাধনা, কর্ম্মই সমষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই সমষ্টির জীবন ও জীবনের সার্থকতা। পক্ষান্তরে কর্ম্মী যাহারা, জীবনসাধক যাহারা, বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে অপরের সাথে লেনা-দেনা করিতে হয়, গ্রহণ করিতে হয় একটা সমষ্টিগত ব্রত ও আদর্শ।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এই সমষ্টিগত ব্রত ও আদর্শ হইতেছে রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও শক্তি; কারণ, ভারতবর্ষের সমষ্টিগত জীবনে এই জিনিষটাই এখন দেখা দিয়াছে প্রথম ও প্রাথমিক প্রয়োজনরূপে। অবস্থার বিপাকে ঘটনার তাড়নায় এইটাই হইয়া উঠিয়াছে আমাদের স্বরাজ। কিন্তু স্বরাজের এটা একটা রূপ মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে (এমন কি আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও) অন্য রকম স্বরাজ-সাধনার চেষ্টা চলিয়াছে রাজ্যশাসনের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ বা যোগ থাকিলেও, এ জিনিষটি সেখানে মুখ্য কথা নয়। আমাদের স্বরাজ-চেতনা ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া জাগিয়াছে, এরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না— কিন্তু এই ইউরোপেই স্বরাজের সাধনা কেমন ভেল বদলাইয়া বদলাইয়া চলিয়াছে তাহা দেখিবার বিষয়। আমরা আজ যেমন বলিতেছি চাই স্বরাজ অর্থাৎ 'পলিটিকাল' মুক্তি, এইটিই আসল জিনিষ, এটি হইলে আর সব জিনিষ আপনা হইতেই ফুটিয়া ফাটিয়া বাহির হইবে, ঠিক তেমনি ইউরোপও একদিন মনে করিয়াছিল যে রাষ্ট্রীয় মুক্তি সাম্য ও শক্তি হইলেই সমষ্টির মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ফরাসী-বিপ্লব এই ভাবটিকেই মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল—আমেরিকা

বা ইতালীতে স্বরাজের বীজ নিক্ষেপ করিয়া যায় এই ফরাসী-বিপ্লব, জর্ম্মণীর রাষ্ট্রীয় প্রতিভা ফুটিয়া উঠে এই বিপ্লবেরই ধাক্কায়। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল পলিটিকাল স্বরাজ অভীষ্টকে আনিয়া দেয় নাই, যে অভাব বোধে লোকে স্বরাজ চাহিয়াছিল, স্বরাজ পাইয়াও সে অভাব তেমনি অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তখন উঠিলেন সেণ্ট সিমন (Saint Simon), কার্ল মার্ক্স (Karl Marx), তাঁহারা বলিলেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা মানুষকে স্বাধীন করিতে পারে না, চাই সামাজিক স্বাধীনতা। সমাজে স্বাধীন কে? যাহার অর্থ আছে। সুতরাং আগে চাই অর্থ বিষয়ে সাম্য ও স্বাধীনতা। এইরূপেই হইল সোসিয়ালিজ্‌মের ভিত্তি-স্থাপন। রাষ্ট্রের আইন-কানুন লোককে ভোট দিবার, প্রতিনিধি পাঠাইবার, আইন গড়িবার বা অন্য রকম যত অধিকারই দিক না কেন, সমাজের অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে সে সব অধিকার কোন উপকারে আসিবে না। সমাজের যে আছে দুইটি শ্রেণী বা স্তর—এক ধনী আর দরিদ্র, এক মহাজন ও মুনিব আর মজুর ও চাকর—ইহার দরুণ নিম্নের যে শ্রেণী নীচের যে স্তর তাহাকে বাধ্য হইয়া উচ্চ শ্রেণীর উপরের স্তরের পদানত হইতে হয়, বড়লোকের সর্ব্ববিষয়ে অনুগত হইয়া চলা ছাড়া ছোটলোকের আর উপায় কি?

পদমর্য্যাদা ক্ষমতা শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নতি, যাহাই বল না কেন, সে সব বড়লোকেরই ভাগ্যে হয়। গরীবদের দিন আনিয়া দিন

খাইতেই পরিশ্রান্ত হইতে হয়, আর এজন্যও বড়লোকদেরই কাছে যাইতে হয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যার অর্থ অর্থের সমস্যা। লোককে অর্থের স্বরাজ পাইতে হইবে, তবে রাষ্ট্রের স্বরাজের একটা অর্থ হইবে। এই অর্থের স্বরাজ লইয়াই ইউরোপের মারামারি এখন চলিতেছে। রুশিয়ায় বলশেভিকেরা খুব জোরে একটা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া এই রকম একটা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অন্ততঃ করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

কিন্তু একটু চিন্তাশীল যাঁহারা, জিনিষকে যাঁহারা তলাইয়া দেখেন, যাঁহারা দূরে নজর দেন তাঁহারা ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিতেছেন এখানে আসিয়াও মানুষের মুক্তি নাই। কুলিমজুর চাষাভুষা সমাজের পতিত দীন দরিদ্র যাহারা তাহারা ধনীর ধন কাড়িয়া লইল, ভাল করিয়া খাইতে পরিতে পারিল, তাহারাই হইল রাজ্যের কর্তা; কিন্তু ইহাতে কি সমাজের পিছাইয়া পড়িবার আশঙ্কা নাই? বলশেভিকদের দেখিয়া কি মনে হয় না দেশটা অতিরিক্ত মাত্রায় বৈশ্য বা বাণিয়া বনিয়া যাইতেছে? শিক্ষার জ্ঞানের চর্চা কি এমন আবহাওয়ায় থাকিতে পারে? সমাজের নিম্নতম স্তর যেখানে মাথায় উঠিয়াছে সেখানে শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান এ সব জিনিষ জন্মিতে পারে, না টিকিতে পারে? সেখানে যে শিক্ষা সম্ভব, যে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় তাহা হইতেছে অর্থকরী শিক্ষা, খাওয়া পরার মালমসলা যোগানের শিক্ষা। পলিটিকাল প্রয়াসের যখন প্রাধান্য ছিল তখন ইকনমিকস্ (economics) আমল পায় নাই; সেই রকম ইকনমিকাল

প্রয়াস যখন প্রধান তখন যে এডুকেশন মানুষের আমল পাইবে না তাহাও কিছু আশ্চর্য্যের নয়। তাই ভয় হয়, মানুষের জীবনকে সচ্ছল করিতে গিয়া, তাহার মনকে উপবাসী না করিয়া রাখি, সমাজে শুধু যাহারা গতর খাটাইয়া চলে তাহাদের সুখ সুবিধা করিতে গিয়া সমস্ত সমাজটাকে একটা গতরখাটান যন্ত্র না বানাইয়া ফেলি।

পাছে সমাজ এই রকমে ক্রমে বর্ব্বরতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সেইজন্য ইতিমধ্যেই প্রত্যেক দেশে আর একদল লোক দেখা দিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, দণ্ডশাসনের সমস্যা অর্থের সমস্যা তারও আগে হইতেছে শিক্ষার সমস্যা—লোকের প্রথম চক্ষু ফুটাইতে হইবে, মনটাকে তৈয়ারী করিতে হইবে, নতুবা আর সব জিনিষ পণ্ডশ্রম মাত্র। আর স্পষ্টই ত দেখা যাইতেছে পলিটিকাল আন্দোলন কর আর economical আন্দোলন কর, তার গোড়ার কথা হইতেছে মনের সাড়া, মনের পরিবর্ত্তন, ফলতঃ আন্দোলন অর্থই হইতেছে একটা শিক্ষা। তবে সে শিক্ষা সুধু একটা দিক লইয়া, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষা। শিক্ষাই যদি গোড়ার কথা হইল, তবে শিক্ষাটাকে ওরকম সঙ্কীর্ণ না করিয়া রাখিয়া ব্যাপক করিয়া তোলা, শিক্ষাকে শিক্ষা করিয়া ধরা। সুতরাং দাঁড়াইল এই, আগে পলিটিকাল স্বরাজ নয়, আগে ইকনমিকাল স্বরাজও নয়, আগে হইতেছে এডুকেশনাল স্বরাজ। মানুষের মনকে বুদ্ধিকে মুক্ত মার্জ্জিত পরিপুষ্ট করিয়া তোল, সব সমস্যার পূরণ আপনা হইতেই হইবে। এখন যে কোন মীমাংসাই

হইতেছে না, শত চেষ্টার ফল হইতেছে শুধু গণ্ডগোল, তার কারণ আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি।

এই শিক্ষা কিরূপে হয়, মানুষের মনকে কি রকমে তৈয়ার করিতে হয়, চিন্তাশক্তিকে কি রকমে বাড়াইতে হয়, জ্ঞানকে কি রকমে জাগাইতে হয় তাহা লইয়া অনেক গবেষণা চলিয়াছে অনেক পরীক্ষাও চলিয়াছে। শিক্ষার অর্থ কি, ইহার উদ্দেশ্য কি, উপায় কি? ব্যষ্টিকে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, গোষ্ঠীকেই বা কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে? একটা নেশনের শিক্ষার ধারা কি, সমগ্র মানবজাতির শিক্ষার ধারাই বা কি? পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ, মনীষিবৃন্দ—Intelligentsia—আগে সেই কথা ভাবিতেছেন, সেই প্রয়াসে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা কিন্তু আরও একটু আগা ইয়া যাইতে চাই। শিক্ষা-সমস্যারও মধ্যে আর একটি সমস্যা অনুস্যূত আছে, আমরা সর্ব্বাগ্রে সেইটার উপর জোর দিতে চাই। মানুষের দেখিতে পাই আছে তিনটি ক্ষেত্র, তিনটি স্তর—দেহ, প্রাণ ও মন। সেই অনুসারে বাহিরের জগতে সমষ্টিকে লইয়া রচিত হইয়াছে তিনটি আয়তন। প্রথমতঃ সমষ্টির দৈহিক আয়তন। মানুষ যাহাতে শান্তিতে থাকিতে পারে, নিরুপদ্রবে চলিতে ফিরিতে পারে, মুক্তভাবে পরস্পর লেনা-দেনা করিতে পারে—ইহাই দৈহিক আয়তনের কথা, ইহারই অন্য নাম পলিটিক্স। পলিটিক্স বা রাষ্ট্রনীতি বা দণ্ডনীতি সমাজের প্রতিষ্ঠা; উহাই মিটাইতেছে সমাজের প্রথম ও প্রাথমিক প্রয়োজন—থাকিবার দাঁড়াইবার জায়গা, চলিবার

বাড়িবার সুবিধা ও অবকাশ। সমাজরূপ জগতের ইহাই পৃথিবী। তারপর দেহের উপরে প্রাণ। প্রাণ কি চায়, প্রাণের ধর্ম্ম কি? প্রাণ চায় বাঁচিয়া থাকিতে, প্রাণের ধর্ম্ম গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা। সমাজের প্রাণ-ধর্ম্ম—জীবন-ধারণ, খাওয়া-পরার কথা লইয়া যে আয়তন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই নাম ইকনমিক্স বা অর্থনীতি। ইহাকে আমরা বলিতে পারি সমাজ-জগতের অন্তরীক্ষ। প্রাণের পরে হইতেছে মন। মানুষ চায় আপনার বলিতে থাকিবার একটা জায়গা, সে চায় বাঁচিবার জন্য খাওয়া-পরা; কিন্তু এখানেই তাহার সব দাবি বা প্রয়োজন শেষ হইল না, সে চায় আবার জানিতে শুনিতে। বরং এই জানাশুনা তাহার যত ভালরকম হইবে, তাহার থাকা ও বাঁচার প্রশ্নটারও তত সুন্দর মীমাংসা হইবে; ইহা ছাড়া জানাশুনারও নিজস্ব একটা আনন্দ, একটা মূল্য আছে। সমাজেরও তাই আছে একটা জানাশুনা অর্থাৎ শিক্ষার সমস্যা—এই শিক্ষা লইয়াই সমাজের মনের আয়তন। দণ্ডনীতি, অর্থনীতি—তাহারও উপরে হইতেছে শিক্ষানীতি, এডুকেশন—ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সমাজ-জগতের দ্যৌ বা স্বর্গ।

কিন্তু দেহ প্রাণ মন হইতেছে মানুষের স্থূলতর আধার। দেহ প্রাণ মন ছাড়াইয়া আছে একটা বস্তু, সেইখানেই মানুষের আসল নিবিড় সত্তা—তাহার নাম আত্মা। পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ—ভূর্ভুবঃস্বঃ—হইতেছে বিষ্ণুর (বা অনন্ত ব্রহ্মের) তিনটি পাদপীঠ। দেহ প্রাণ মন হইতেছে আত্মার ত্রিধা ভিন্ন প্রকাশ। মানুষ

দেহকে চায় দেহের জন্য নয়, আত্মার জন্য; মানুষ প্রাণকে চায় প্রাণের জন্য নয়, আত্মার জন্য; মানুষ মনকে চায় মনের জন্য নয়, আত্মার জন্য। এই আত্মাকে জানিতে পারিলে, মানুষ সত্যভাবে পূর্ণভাবে পায় তাহার মনকে, প্রাণকে ও দেহকে। ঠিক সেই রকম, সমাজের যে দণ্ডনীতিক, অর্থনীতিক, শিক্ষানীতিক আয়তন তাহাদের মূল হইতেছে একটা আত্মিক আয়তন—সেইটাই প্রধান ও গোড়ার কথা। এই নিগূঢ় আয়তনটিই আর সকল আয়তনকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্য দিয়া আপনাকে সৃষ্টি করিতেছে।

মানুষের সামাজিক প্রচেষ্টা সব যে আশানুরূপ ফল দিতেছে না, তাহার কারণও আমরা ঠিক এখন বুঝিতে পারিব। আমরা প্রথমে চাহিয়াছি শুধু দেহের মুক্তি, তারপর চাহিয়াছি প্রাণের মুক্তি, তারপর চাহিতেছি মনের মুক্তি; কিন্তু সব মুক্তি সম্ভব ও সার্থক হইবে তখনই যখন চাহিব আত্মার মুক্তি—অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের, বিশেষ বিশেষ আয়তনের স্বরাজ নহে, কিন্তু আত্মার স্বারাজ্য। ব্যষ্টিগত হিসাবে যাহা সত্য, সমষ্টিগত হিসাবেও তাহাই সত্য। সমাজের, দেশের, জাতির আত্মা কোথায়, সেই দিকে সকলের আগে দৃষ্টি দিতে হইবে, সেই সমষ্টিগত আত্মার উদ্বোধন আগে করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় স্বরাজ পাইলে দেশ জাতি সমাজ মুক্তি পাইবে না; অর্থনীতিক স্বরাজ অর্থাৎ খাওয়া-পরার সুশৃঙ্খলা সুবন্দোবস্ত হইলেও সে মুক্তি পাইবে না; এমন কি শিক্ষানীতিক স্বরাজ অর্থাৎ লেখাপড়া, বিদ্যা পাণ্ডিত্য জ্ঞানগুণে ভরপূর হইলেও নহে। আগে চাই সমাজ-আত্মার স্বারাজ্য।

আমরা এমন কথাও বলিতে পারি, এই স্বারাজ্য না হইলে অন্য-সব স্বরাজ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। একের পর একে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, তার অর্থই হইতেছে ভিতরে সেই আত্মার স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার ঈষণা—স ঐচ্ছৎ।

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের কথার এমন অর্থ নয় যে, দেশের এই সমষ্টিগত স্বারাজ্য-সিদ্ধি যতদিন না হইতেছে ততদিন ইতরতর স্বরাজের সাধনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, বা সে সব দিকে কোনই মনোযোগ দিতে হইবে না। ব্যষ্টিকে আমরা যেমন বলি না যে কর্ম্মজগৎ হইতে অপসৃত হইয়া দেহ প্রাণ মনকে নাকচ করিয়া সে ধ্যানস্থ সমাধিস্থ হউক, আগে লাভ করুক অন্তরাত্মার স্বারাজ্য, পরে কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া অন্তরাত্মার স্বারাজ্য সিদ্ধি প্রয়োগ করুক দেহে প্রাণে মনে। ব্যষ্টিকে আমরা বলি দেহের প্রাণের মনের সহজ অবস্থা স্বাভাবিক ক্রিয়াকে অব্যাহত রাখিয়া, তাহারই মধ্যে অধ্যাত্মকে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতে, জাগ্রতের মধ্যে চলিতে চলিতেই সমাধির চিৎশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে, সমাধির চিৎশক্তি দিয়া জাগ্রতভাবেই সেই জাগ্রতকে রূপান্তরিত করিতে। ঠিক সেই রকম সমাজের যে সহজ যে প্রয়োজনীয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজীবন—তাহার পলিটিক্স, তাহার ইকনমিক্স, তাহার এডুকেশন—সে সমস্তই চালাইতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে ধরিতে হইবে সমাজের অন্তরাত্মা, দেখিতে হইবে উহাদের মধ্যে কতখানি ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিয়াছি এই সমাজের

অন্তরাত্মা। সব স্বরাজ সাধনা যুগপৎ ও অবিরাম চলিবে; কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে লক্ষ্য হইবে সামাজিক স্বারাজ্যের প্রতীক বা বিগ্রহ হইয়া উঠা; যে স্বরাজ যতখানি স্বারাজ্যের মূর্ত্তি লইয়া উঠিয়াছে, যে স্বরাজের পিছনে আছে যতখানি জাগ্রত স্বারাজ্যের চেতনা, সেই স্বরাজই ততখানি সত্য ও সার্থক।

আমাদের দোষ বা অভাব এইখানে যে সমাজের এক একটি অঙ্গকে আমরা ভিন্ন করিয়া লই এবং তাহারই মুক্তি ও ঋদ্ধির চেষ্টা করি বাকী সকলকে স্রেফ বাদ দিয়া রাখি, অথবা একটিকেই প্রধান করিয়া লইয়া তাহারই স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর আর সকল অঙ্গকে নিযুক্ত করিয়া দেই। কেহ বলেন চাই রাষ্ট্রীয় সাম্য ও স্বাধীনতা, এইটি হইলে আর সব আপনা হইতেই হইবে; ইহার জন্য, ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া অর্থনীতিকে সাজাও ও প্রয়োগ কর—'স্বদেশী' ও 'বয়কট' কর; শিক্ষার বন্দোবস্তও এমন ভাবে কর, তাহা যেন রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগাইয়া তুলে, রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত ও উদ্যোগী করিয়া তুলে। কেহ বা বলেন, চাই জীবনের স্বচ্ছলতা অর্থের যথেষ্ট উৎপাদন ও ন্যায্য ভাগবাটরা—সেই জন্যই যথাযোগ্য গবর্ণমেণ্ট তৈয়ারী কর, কর ডেমক্রাটিক বা সোসিয়ালিষ্টিক রাষ্ট্র; আর দাও এমন শিক্ষা যাহাতে লোকে খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে পারে, সমাজের ধন বৃদ্ধি করিতে পারে। আবার কেহ বলিতেছেন, না, ওসব আসল উদ্দেশ্য নয়—আসল উদ্দেশ্য শিক্ষা জ্ঞানার্জ্জন, সমাজকে বিদ্যায় বুদ্ধিতে মার্জ্জিত সমলংকৃত করিয়া, cultured করিয়া তোলা

রাষ্ট্রকে এই উদ্দেশ্যে গড়িতে হইবে, অর্থের যথাযথ বন্দোবস্ত এইজন্যই করিতে হইবে।

কিন্তু আসলে সমাজের প্রত্যেক অঙ্গকে আলাদা আলাদা দেখা উচিত নয়, দেখা উচিত গোটা সমাজকে। সমাজের প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট, ওতঃপ্রোত বিজড়িত; তাই বলিয়া আবার কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়া আর কয়েকটিকে তাহার ছায়ায় আওতায় ফেলিয়া রাখাও উচিত নয়। প্রত্যেক অঙ্গের আছে নিজস্ব সত্য, নিজস্ব প্রয়োজন, নিজস্ব সার্থকতা; তাই চাই প্রত্যেকের যুগপৎ মুক্তি ও ঋদ্ধি—স্বরাজ সিদ্ধি এবং সকলের সম্মেলন ও সামঞ্জস্য। সকলের এই ঐকৈক পূর্ণতা ও সমবেত সামঞ্জস্য পাইতে হইলে, কেবল ঐ গুলিকে লইয়া সাধনা করিলে, উহাদের সহিত সমান স্তরে থাকিলে চলিবে না, আমাদের দৃষ্টি আরও একটু উপরে ও গভীরে চালাইতে হইবে, সমষ্টিগত চেতনাকে, সমাজের সর্ব্বসাধারণ ইচ্ছাশক্তিকে আরও একটা উর্দ্ধতর নিবিড়তর স্তরে উঠাইয়া ধরিতে হইবে, খেলাইয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ সমাজের সমবেত সত্তাকে স্বারাজ্য-সিদ্ধি পাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন সমাজের স্বারাজ্য জিনিষটা কি? ব্যক্তির স্বারাজ্য কতকটা বুঝিলেও বুঝিতে পারি, কিন্তু গোষ্ঠীর বা সমষ্টির স্বারাজ্য বস্তুটা তেমন সুস্পষ্ট নয়। তারপর ব্যক্তিগত স্বারাজ্য সিদ্ধির উপায়ও ধরা সহজ, কিন্তু একটা দেশের একটা জাতির, একটা মানব-সঙ্ঘের, অধ্যাত্ম সাধনা চলে কি ভাবে, কোন্ পথে?

প্রথমতঃ, সমষ্টিগত স্বারাজ্য হইতেছে সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টির স্বারাজ্য অর্থাৎ ব্যষ্টির সেই স্বারাজ্য যাহা শুধু ভিতরের অন্তরাত্মার বস্তু নয়, কিন্তু যাহা আবার জীবনে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। যে মানুষ নিজের আত্মাকে নিজের ভাগবত সত্তাকে পাইয়াছে, যে মানুষ কেবল দেহের প্রাণের মনের বৃত্তি বা প্রেরণা অনুসারে চলিতেছে না কিন্তু চলিতেছে আত্মার সত্যে ঋতে ও আনন্দে এবং তাহাকেই মনে প্রাণে দেহে ফুটাইয়া ধরিয়াছে ; যে মানুষ সহজ জীবনের স্বাভাবিক আয়তন সমূহ ঢালাই করিয়া লইতেছে অতীন্দ্রিয় জীবনের ছাঁচে ; যে মানুষ অপর মানুষের সহিত সম্বন্ধ যোগাযোগ স্থাপন করিতেছে, জীবিকানির্ব্বাহের উপায় স্থির করিতেছে, শিক্ষাদীক্ষায় আপনাকে ভরিয়া তুলিতেছে অন্তরাত্মার জ্ঞান ভোগ আনন্দের টানে টানে, এই রকম মানুষের সমষ্টি লইয়া যে সিদ্ধি তাহাই হইতেছে সমষ্টিগত স্বারাজ্য সিদ্ধি। আর এই সমষ্টিগত স্বারাজ্য সিদ্ধির উপায়ও হইতেছে, প্রত্যেক ব্যক্তির আপন আপন স্বারাজ্য সিদ্ধির পথে চলা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে স্বারাজ্য পাইলেই চলিবে না ; ফলতঃ আমরা যে ব্যষ্টিগত স্বারাজ্যের কথা বলিয়াছি তাহা পৃথক পৃথক ভাবে পাওয়াও সম্ভব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভিতরে একটা সমষ্টির সত্তা উপলব্ধি করিতে হইবে, এক অপরের সহিত অভিন্নাত্মক বুদ্ধি লইয়া চলিবে। প্রত্যেকে যে প্রত্যেকের সহিত একত্ব বা অভিন্নতা অনুভব করিবে তাহা প্রয়োজনের সুবিধার জন্য নয়, ইহার অন্য নাম সহযোগীতা নয় ;

স্বরাজ ও স্বারাজ্য

'আমি আছি' যেমন একটা সহজ অখণ্ড সত্য, সেই রকম 'আমরা আছি' ইহাও একটি সহজ অখণ্ড সত্য ; 'আমি'র পূর্ণতা সার্থকতার সাথে সাথে চলিবে 'আমরা'র পূর্ণতা সার্থকতা। আর এই 'আমরা' শুধু কতকগুলি 'আমি'র যোগফল নয়, এই 'আমরা'র আছে একটা নিজস্ব সত্য, নিজস্ব ধর্ম্ম। 'আমি' হইতেছি এই 'আমরা'র একটা অঙ্গ, একটা যন্ত্র, একটা কেন্দ্র। এই আমরাকে যতখানি শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি 'আমি'ও ততখানি শুদ্ধ ও সিদ্ধ। অন্য কথায়, বহু ব্যষ্টিকে একত্র করিলেই সমষ্টি হয় না—যেমন সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জোড়া দিয়া এক সঙ্গে করিলেই সজীব মানব আধার হয় না। প্রত্যেক ব্যষ্টির পিছনে আছে একটা সমষ্টি, এই সমষ্টিই সেই ব্যষ্টিকে ধারণ করিয়া আছে, প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যষ্টিকে আপন আপন সত্তায় চেতনায় আপনার সমষ্টিগত সত্তাকে চেতনাকে সম্যক্ জাগরিত করিতে হইবে। তারপর ব্যষ্টির যে রকম জীবনের ধারা ও লক্ষ্য আছে সমষ্টিরও সেই রকম জীবনের ধারা ও লক্ষ্য আছে—ব্যষ্টির জীবনের ধারার ও লক্ষ্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সেই সমষ্টিরই জীবনের ধারা ও লক্ষ্য। প্রত্যেক ব্যষ্টিকে দেখিতে হইবে সমষ্টির সেই নিবিড় জীবনধারা সে কতখানি ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতেছে।

এই ভাবে দেখিলে সমষ্টিগত স্বারাজ্য সিদ্ধি হইতেছে সেই বস্তু যখন সমষ্টির আছে যে একটা বিরাট আত্মচেতনা, একটা জীবনপ্রবাহ তাহারই জ্যোতিতে তাহারই শক্তিতে প্রত্যেক ব্যষ্টি

গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই সার্থকতার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক আয়তন প্রয়োজনমত ছাঁচরূপ পাইয়াছে ধর্ম্মকর্ম্ম পাইয়াছে। ইহার পথ হইতেছে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে মিলিয়া, আত্মার সহিত আত্মার বিনিময় করিয়া গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ বা চক্র গড়িয়া, একটা পূর্ণ অখণ্ড সমাজ জীবনের স্রোত তাহার মধ্যে বহাইয়া দেওয়া।

আধুনিক সমাজের প্রতিষ্ঠান সব গড়িয়া উঠিয়াছে, সামাজিক জীবন একটা রূপ পাইয়াছে, মানুষের প্রাকৃত স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া, মানুষের দেহের ও প্রাণের ও কথঞ্চিৎ মাত্র মনের দাবি মিটাইবার জন্য। সমাজে স্বারাজ্য অথবা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে তখনই যখন সমাজ গড়িয়া উঠিবে মানুষের অন্তরাত্মার লেনাদেনার ফলে, বাহিরের চাপে বা অভাবের প্রয়োজনে যখন মানুষে মানুষে আদান প্রদান চলিবে না কিন্তু মানুষ যখন ফুটাইয়া তুলিবে একাত্মতার ঐশ্বর্য্য। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের পাওয়া চাই নিজের আসল খাঁটি সত্তা, নিজের অন্তরাত্মা, নিজের ভাগবত পুরুষ, আর ইহারই প্রেরণায় নিজ নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ ও ঋদ্ধ করিয়া চারিদিকে তদনুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা চাই। এই সাথে আবার ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে ধরা চাই সমষ্টির যে একটা নিবিড় সত্তা ও চেতনা, একটা তপঃশক্তি তাহার জীবন শৃঙ্খলার মধ্যে তাহার আন্দোলন বিলোড়নের মধ্যে তাহার ক্রমপরিণতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে; সমষ্টির এই গুহাস্থিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত মিলাইয়া, জাগ্রতে সংযোগ

রাখিয়া সমষ্টির কর্ম্মপ্রয়াস যখন বিকশিত হইতে থাকিবে, ব্যষ্টিরও জীবন যখন তাহাকে উপচিত করিয়া চলিবে তখন সকল স্বরাজ চেষ্টা স্বারাজ্যেরই এক একটি অব্যর্থ বিভূতি হইয়া উঠিতে থাকিবে।

সমষ্টি-পুরুষ

ব্যক্তির যে একটা নিজস্ব সত্তা ও চেতনা আছে এবং তাহারই প্রকাশ স্বরূপ আছে একটা স্বধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য, এ সত্যটি মানুষের কাছে এক রকম স্বতঃসিদ্ধ। এ সত্যটির উপর আমরা জোর দেই বা না দেই, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু মনে মনে ইহাকে বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য হই, ইহার উল্টাটি বিশ্বাস করা অসম্ভব যদি না হয় তবে বড়ই দুঃসাধ্য। মানুষের ব্যক্তিত্বকে আমরা যখন ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করিয়াছি, অথবা যখন পীড়িত দলিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, উভয়ত্রই ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। প্রত্যেক মানুষের যে একটা সজীব আত্ম-সত্তা আছে, প্রাচীনকালে হউক আর আধুনিক কালে হউক, এ কথাটি মানিয়া লইতে কোন দিন বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, বরং না মানিয়া লইতেই যাহা কিছু বেগ পাইতে হইয়াছে।

আধুনিক কালে কিন্তু আর একটা নূতন কথা আমাদিগকে শুনিতে হইতেছে; সেটা এই যে শুধু ব্যক্তির নয়, ব্যক্তির মত ব্যক্তি সংগ্রহের—দলের, গোষ্ঠীর, সমষ্টিরও আছে একটা নিজস্ব সত্তা ও চেতনা, একটা স্বধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য। Group-mind;

সমষ্টি-পুরুষ

Social consciousness—আজকালকার দর্শনের বিজ্ঞানের একটা মস্ত আবিষ্কার, তর্ক-বিতর্কের একটা লোভনীয় ক্ষেত্র। এখন এই যে জিনিষটি সংঘ বুদ্ধি, গোষ্ঠীর মন, সমাজগত চেতনা প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইতেছে, তাহা কি ?

কথাটা এই, যখন দুইটি ব্যক্তি আলাদা আলাদা থাকে তখন তাহারা শুধু এক এক, কিন্তু যখন পরস্পর মিলিত হয়, উভয় উভয়ের সহিত আদান প্রদান করে তখন তাহারা একে একে দুই নয়, দুইএর বেশী একটা কিছু। একটা দল দলের অন্তর্গত যতগুলি মানুষ তার যোগফল নয়; যোগফলের চাইতে ঢের বেশী। একজন লোক একা যদি একটি কাজ আট ঘণ্টায় শেষ করিতে পারে, তবে ত্রৈরাশিক অনুসারে আটজন লোকের সে কাজ করিতে একঘণ্টা লাগিবে প্রমাণ হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় যে এক ঘণ্টা লাগে না, তারও কম লাগে। লোক এক সঙ্গে হইলে জোট বাঁধিলে প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক হিসাবে যে সামর্থ্য যে মূল্য তার চেয়ে তার বেশী সামর্থ্য, বেশী মূল্য হয়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তির শক্তির মাত্রা যে বাড়িয়া যায় তাই নয়, শক্তির ধরণও অন্য রকম হইতে পারে ও হইয়া যায়। একা আমি যে ধরণের কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, দলের মধ্যে পড়িলে স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও ঠিক সেই কাজ আমি হেলায় করিয়া ফেলিতে পারি।

ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সমাবেশে, সংঘর্ষে আদানে-প্রদানে সংঘ জিনিষটি গড়িয়া উঠে, সুতরাং ব্যক্তিই অর্থাৎ ব্যক্তিরাই সংঘকে সৃষ্টি করিতেছে বলিতে হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ব্যক্তিরা যখন

সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা নিজে নিজে থাকে তখন কিছু নয়, কিন্তু যখনই পরস্পরের সংস্পর্শে সম্বন্ধে আসিয়াছে, তখনই এই সংস্পর্শ এই সম্বন্ধ একটা পৃথক নিজস্ব সত্তা পাইয়াছে, একটা বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, আর ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত গঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যক্তিই প্রথমে সঙ্ঘকে সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্ট হইবামাত্র এই সঙ্ঘই আবার ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিকে মানুষই সমাজকে বানাইয়াছে, আর একদিকে কিন্তু সমাজও মানুষকে বানাইতেছে।

একটা ব্যাপার হয়ত অনেকেরই চোখে লাগিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই সমাজের একটি নিয়ম ব্যক্তিগত হিসাবে কেহই মানেন না বা মানিতে চাহেন না, কিন্তু সমষ্টিগত হিসাবে না মানিয়া উপায় নাই; প্রত্যেকেই অপর সকলের দোহাই দিতেছেন আর পাঁচ জনে যদি করে তবে আমি করিব, কেহই যেন এই পাঁচ জনের অন্তর্ভুক্ত নয়—এই পাঁচ জন যেন কি একটা অশরীরী জিনিষ। কিন্তু বাস্তবিকই এই পাঁচজনের সমষ্টি বা পঞ্চায়েৎ একটা আলাদা বস্তু, পাঁচজনকে শুধু এক সাথে করিলেই তাহাকে পাওয়া যায় না, তাহা অশরীরী বটে কিন্তু সে একটা বাস্তব জিনিষ, তাহার আছে একটা সত্তা, একটা শক্তি। সচরাচর এই জিনিষটিকে অভ্যাস বা সংস্কার নাম দিয়া সমাজসংস্কারকেরা উড়াইয়া দিতে চাহেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেই দেখেন, আলাদা আলাদা ভাবে লইলে কোন ব্যক্তির মধ্যে যে জিনিষটির শিকড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, মোটের উপর সে জিনিষটি কোথা হইতে একটা দুর্নিবার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। এই

ব্যাপারের কারণ আর কিছুই নয়, আমরা যেমন বলিয়াছি ইহাতে প্রমাণ হয় যে, ব্যষ্টি ছাড়া সমষ্টিরও আছে একটা জীবন্ত সত্তা—তাহারই হাতে ব্যষ্টি চলিয়াছে কলের পুতুলের মত।

আরও একটা কথা—বিজ্ঞানে বলিতেছে, ঘটনাতেও সপ্রমাণিত হইতেছে যে, এই সমষ্টিগত সত্তা একটা অচেতন জড় পদার্থ নয়, ইহার শক্তিও অন্ধ নয়; সমষ্টিগত সত্তায় আছে জীবনের একটা বিশেষ ধারা, একটা লক্ষ্য; একটা শৃঙ্খলা। ব্যষ্টি যেমন একটা উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া, সেই অনুযায়ী পথ খুঁজিয়া চলে, সমষ্টিও সেই রকম একটা সার্থকতার জন্য উপায় বাহির করিয়া চলে। সমষ্টিও যেন একটা সচেতন সজ্ঞান জীব বা পুরুষ। ব্যষ্টি-আত্মা হইতেছে এই বিরাট আত্মার, এই মহাপুরুষের এক একটি অঙ্গ। আমাদের স্মরণে পড়িতে পারে বেদের সেই 'সহস্র শীর্ষ সহস্র পাদ' পুরুষের কথা, অথবা গীতার সেই 'ঐশ্বর রূপে'র কথা। প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্যে নিহিত আছে একই সমষ্টিগত চেতনা, প্রত্যেক ব্যষ্টিই এই সমষ্টিগত চেতনার এক একটি মুখ। এই সমষ্টিগত চেতনাকে ব্যষ্টি সজ্ঞানে জানিতে না পারে, তাতে কিছু আসে যায় না; কার্য্যতঃ ব্যষ্টি সমষ্টির ধর্ম্ম অনুসারেই চলিয়াছে, তাহার একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত পথ নাই। এক চেতনা বা এক মন কি রকম ভাবে একটা দলের প্রতি ব্যক্তির মধ্য দিয়া কাজ করে তাহা জনতার ভীড়ের হাটের হুজুগের কার্য্যকলাপ দেখিলেই বুঝিতে পারি। তা ছাড়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহার একটি বড় সুন্দর প্রমাণ যোগাড়

করিয়াছে। দেখা যায়, কোন পালের একটি ঘোড়াকে কোন বিশেষ একটা বিদ্যা বা কৌশল শিখাইয়া দিলে, অন্যান্য সব ঘোড়া খুব সহজে কেমন আপনা হইতেই সেটি পরে শিখিয়া ফেলে। আর এ জন্যে পালের জন্তুদিগকে এক সঙ্গে একই জায়গায় থাকিতে হইবে এমনও কোন প্রয়োজন নাই; ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকিলেও ফল প্রায় একই হয়, বড় জোর অল্প সময়ের জন্য একসাথে রাখিলেই চলে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া আজকাল বেশ জোরের সহিত বলা হইতেছে যে, সমষ্টি বাঁধিলেই তাহার অঙ্গে চেতনা ও শক্তি লইয়া একটা পৃথক সত্তা; অথবা মানুষ যে দল বাঁধে, সমাজ গড়ে তাহার কারণই হইতেছে এই রকম একটা সমষ্টিগত জাগ্রত সত্তার চাপ। এই সমষ্টিরও আছে আবার নানা স্তর আর নানা মূর্তি। সমগ্র মানবজাতি লইয়া যে সমষ্টি তাহার আছে এই রকম একটা সত্তা। "কম্‌ৎ" এর Religion of Humanity মাঝে কবি-কল্পনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, আজ আবার তাহাকে নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়া লোকে সত্য বলিয়াই মানিবার উপক্রম করিয়াছে। মানবজাতি বলিয়া একটা জীবন্ত সত্তা আছে—তাহার আছে একটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, একটা চিন্ময় শক্তি প্রত্যেক মানুষকে ধরিয়া ধরিয়া যে কাজ করিতেছে, মোটের উপর সমস্ত মানুষকে লইয়া চলিয়াছে একটা বিশেষ সাধনা, একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে। তার পর মানবজাতির মধ্যে আছে যে আবার দেশ-ভেদ, প্রত্যেক দেশেরও আছে

সেই রকম একটা অন্তরাত্মা, একটা অন্তর্য্যামী পুরুষ। ম্যাটসিনীর উপলব্ধিও ভাবুকের ভাবপ্রবণতা নয়, তাহা ব্যষ্টিরই সাক্ষাৎ দৃষ্টি। এমন কি দেশের মধ্যেও যে নানা সঙ্ঘ, মণ্ডলী, সমবায়, সমিতি সহজেই গড়িয়া উঠে তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে একটা অখণ্ড সজীব সত্তা (Personality)। আজকাল সমষ্টি-তন্ত্রের (socialism) সব চেয়ে আধুনিক যে সব পরিণতি দেখিতেছি, তাহাদের সকলেরই মূলমন্ত্র হইতেছে দলের ব্যক্তিত্ব (group-persons). *

সুতরাং মোটের উপর দাঁড়াইল এই যে, প্রত্যেক ব্যষ্টির যেমন আছে ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আত্মা বা অন্তরাত্মা বা অন্তর্য্যামী পুরুষ, ঠিক সেই রকম সকলপ্রকার সমষ্টিরও আছে আপন আপন ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আত্মা বা অন্তরাত্মা বা অন্তর্য্যামী পুরুষ। এখন একটি প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে। তবে কি individual soul বা person যে ধরণের যে স্তরের সত্য, Group-soul বা Group-person ও ঠিক সেই ধরণের সেই স্তরের সত্য? উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। Group-soul তৈয়ারী করা জিনিষ সুতরাং কৃত্রিম, Individual soulরা

* "There is a College mind, just as there is a Trade Union mind, or even a "public mind" of the whole community ; and we are all conscious of such a mind as something that exists in and along with the separate minds of the members, and over and above any sum of those minds created by mere addition."—*Political Thought in England. Vol. II, Home University Library.*

মিলিয়া তাহাকে তৈয়ার করিয়াছে। Individual soul তৈয়ার করা জিনিষ নয়, সেটা পাওয়া জিনিষ, স্বাভাবিক, নৈসর্গিক, শাশ্বত, সনাতন; সমষ্টি কিন্তু আজ নাই কাল আছে, পরশু হয়ত থাকিবে না, নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। কলেজ বা "ট্রেড ইউনিয়নে"র কথা ছাড়িয়া দিলাম, একটা দেশের কথাই ধরি না কেন; ভারতবর্ষ বলিয়া এক কালে কিছুই ছিল না, ভারতবর্ষের ভূখণ্ডও ছিল না, ভারতবাসীও ছিল না, ভূখণ্ড সৃষ্ট হইলে অনেক পরে মানুষ আসিয়াছে, মানুষ আসিলেও তাহাদের মধ্যে লেনা-দেনা হইলেও সে সমষ্টিগত চেতনা গড়ে নাই, সেটা অনেক পরের কথা; ভবিষ্যতেও এই সমষ্টি যে চূর চূর হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে না, ধ্বংস পাইবে না তাহারই ঠিক কি? পক্ষান্তরে, জীবাত্মা ব্যষ্টি-পুরুষ ত— নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। কিন্তু এ কথার অর্থ কি? মানুষ, জীবও কি পৃথিবীতে চিরকালই ছিল, চিরকালই থাকিবে কি? বিজ্ঞান ত সে কথা স্পষ্টাক্ষরে না বলিতেছে। যদি বল জীব-আত্মা ছিল ও থাকিবে এক ভাবে না এক ভাবে—প্রকাশে না হউক, অপ্রকাশে—সেই অনন্ত চেতনার সেই মহা-সত্তার মধ্যে; আর প্রকাশেও মানুষ রূপে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধরিতে পারে আর একটা বিগ্রহ। ঠিক কথা, কিন্তু সমষ্টি-আত্মার সম্বন্ধেও সেই একই সত্য প্রযোজ্য। জীবাত্মা ক্রমবিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে আধার বদলাইয়া বদলাইয়া আসিতেছে, তবুও জীবাত্মা জীবাত্মাই আছে; সেই রকম সমষ্টি-আত্মার ক্রমে রূপ বদলাইয়া বদলাইয়া আসিতেছে; নেশন রূপ এক সময় ছিল না,

ছিল গোষ্ঠী কুল (clan, tribe) তাহারও আগে ছিল পরিবার— ব্যষ্টি-আত্মার মতই সমষ্টি-আত্মার অসদ্ভাব হয় নাই, কখন হইবেও না। আর সমষ্টি যদি ধ্বংস পায় তার অর্থ জীবাত্মার মত তাহাও পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। অধিকন্তু, কোন বিশেষ সমষ্টি—যেমন কোন বিশেষ দেশ—চিরদিনের নয়, বিশেষ ব্যক্তিও সেই হিসাবেই চিরদিনের নয়। প্লেতো আজ নাই কিন্তু প্লেতোর প্রভাব (spirit) আছে; সেই রকম গ্রীস নাই কিন্তু গ্রীসের প্রভাব আছে। যদি পুনর্জন্ম মানি ও বলি প্লেতো আর একটি মানুষ হইয়া আজ জগতে আছেন, সেই রকম বলিতে পারি না কি গ্রীসের অন্তরাত্মাও অন্যভাবে অন্যরূপে আজ বর্ত্তমান? প্লেতোর আত্মা যে হিসাবে নিত্য সনাতন, প্লেতোর ব্যক্তিত্ব (personality) সে হিসাবে নিত্য সনাতন নয়; তুলনায় আমরা বলিতে পারি না কি গ্রীসের ব্যক্তিত্ব (personality) লয় পাইলেও, তাহার আত্মাটি আছেই? ফলতঃ, জীবের জন্ম মৃত্যু ও জীবন সম্বন্ধে গীতা যে বলিয়াছেন—

> অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
> অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥

সমষ্টির জন্ম, মৃত্যু ও জীবন সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে।

তার পর, ব্যক্তি হইতেছে স্বাভাবিক মুখ্য আদি বস্তু, আর সমষ্টি হইতেছে কৃত্রিম গৌণ ও পরবর্ত্তী; ব্যক্তিই গোড়ায় সমষ্টিকে গড়িয়াছে, সমষ্টি যদি ব্যক্তিকে গড়িয়া থাকে তবে তাহা শেষে— এ সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, সমষ্টি-বিশেষের গোড়া পত্তনের

দিন ও ক্ষণ আবিষ্কার করা গেলেও, সমষ্টি জিনিষটার উৎপত্তি কবে হইল তাহা ব্যক্তির উৎপত্তি নির্ণয় করার মতই দুঃসাধ্য। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সংস্পর্শে সমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে,সত্য কথা; কিন্তু সংস্পর্শ আদৌ আরম্ভ হইল কবে? ফলতঃ ব্যষ্টি সমাজের ঐতিহাসিক কারণ ততখানি নয়, যতখানি ওটি হইতেছে একটা সিদ্ধান্তের পূর্ব্বপক্ষ (logical antecedent)। ব্যষ্টি সমষ্টিকে তৈয়ার বা সৃষ্টি করিয়াছে, এক দিক দিয়া দেখিলে এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে আমরা বলিতে পারি, ব্যষ্টি সমষ্টিকে তৈয়ার বা সৃষ্টি করে নাই, সমষ্টি জিনিষটা পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহার প্রকাশের প্রণালী ফুটাইয়া দিয়াছে ব্যষ্টি; অথবা, সমষ্টি জিনিষটা যেন বিদেহী, সূক্ষ্ম-অবয়বাত্মক, ব্যষ্টির মধ্য দিয়া ব্যষ্টির স্পর্শে তাহা জাগ্রত শরীর স্থূল-দেহ পাইয়াছে। সমষ্টি যে কৃত্রিম তাহা নয়, ব্যষ্টির মতই তাহা স্বাভাবিক।

তবে এটা সত্য যে ব্যবহারিক জগতে ব্যষ্টির উপরই আমাদিগকে বেশী জোর দিতে হয়, কারণ ব্যষ্টি এমন একটা জিনিষ যাহাকে সহজে ধরা ছোঁয়া চলে; ব্যষ্টিকে ধরা ছোঁয়া সহজে চলে তাহার উপর বেশী জোর দিতে হয় আবার ঠিক এইজন্যই যে ব্যষ্টি হইতেছে সমষ্টিরই মুখপাত্র, ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিভিন্ন ধর্ম্মাত্মক বা শত্রুভাবাপন্ন নয়, উভয়ে একই জিনিষের দুই দিক - একটি স্থূল আর একটি সূক্ষ্ম, একটি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আর একটি অন্তরগ্রাহ্য, একটি কেন্দ্র আর একটি সেই কেন্দ্রকে ধরিয়া টানা হইয়াছে অথবা কেন্দ্রের চারিদিকে আছে যে বৃত্ত। সমষ্টিকে ধরিতে গেলে ব্যষ্টির

হাত দিয়া যাইতে হয়—কর্ম্মজীবনের এই লেনা-দেনার দিক দিয়া দেখিলে আমরা ব্যষ্টিকে মুখ্য প্রথম আর সমষ্টিকে গৌণ অপর জিনিষ বলিতে পারি, কিন্তু সেটা আমার বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গীর কথা, আসল সত্যের কিছু ইতর বিশেষ তাহাতে হয় না। সমান ভাবে দেখিলেই দুই-ই মুখ্য, দুই-ই প্রথম।

আধুনিক যুগের লক্ষ্য ও সাধনা ব্যষ্টির মধ্যে আছে যে সমষ্টির চেতনা তাহাকে জাগাইয়া তাহার সহিত এক হইয়া তবে ব্যষ্টি নিজ নিজ জীবন চালাইয়া লইবে। ইহাতে ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব যে কিছু খর্ব্ব হইবে এমন কোন কথা নাই। ফলতঃ, আমরা যদি সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা একটু করি, তবে স্পষ্টই দেখিতে পাই যে গোড়ায় মানুষ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের একটা সহজ সম্মিলন ও সামঞ্জস্য দিয়াই সমাজকে চালাইয়াছে। আদি ও আদিম সমাজে সমষ্টির প্রেরণায় ও প্রয়োজনে ওতপ্রোতঃ হইয়াই ব্যষ্টি তাহার নিজের প্রেরণা ও প্রয়োজনের সার্থকতা পাইয়াছে। তবে সেটি হইতেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক খেলার ফল। মানুষের মধ্যে তখন সমষ্টির চেতনা যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, মানুষ যে সজ্ঞানে সমষ্টির সাথকতার মধ্যে নিজের ব্যষ্টিগত সার্থকতা পাইয়াছে বা নিজের ব্যষ্টিগত সাথকতার মধ্যে ফলাইয়া ধরিয়াছে, তাহা নয়। মানুষ চলিয়াছে স্বভাবের সহজ সংস্কারের বশে, প্রকৃতি তাহাকে যে ভাবে যে পথে লইয়া গিয়াছে—তাহাতেই আসিয়াছে এই নৈসর্গিক সম্মিলন ও সামঞ্জস্য। সমাজে ব্যষ্টি স্বাতন্ত্র্য, সমাজ হইতে আলাদা নিজের একটা সত্তা ও সার্থকতা মানুষ চাহিয়াছে পরে, যখন জাবন

শুধু আদি ও আদিমস্তরে শুধু গ্রাসাচ্ছাদন ও তদনুযায়ী প্রতিষ্ঠান ও শৃঙ্খলার মধ্যে আর থাকিতে চাহে নাই, যখন সে চাহিয়াছে বৃহত্তর উন্নততর জীবন, প্রাণের প্রেরণায় না চলিয়া যখন সে চলিতে চাহিয়াছে জ্ঞানের বুদ্ধির বিচারের আলোকে। একান্ত ব্যষ্টিবাদ অথবা একান্ত সমষ্টিবাদ অর্থাৎ ব্যষ্টির ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হইতেছে এই যুগের কথা। জীবনকে যখন শুধু চলিয়া যাইতে দিই না, কিন্তু চালাইতে চাই সজাগ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা, কর্তৃত্ববোধের দ্বারা, প্রকৃতির যন্ত্র মাত্র হইয়া যখন আর তৃপ্তি হয় না, মনে জাগে প্রকৃতির প্রভু হইয়া তাহাকে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা, তখন প্রথম ফুটিয়া উঠে একটা ভেদ, একটা অসামঞ্জস্য—কর্তৃত্ববোধকে বাড়াইতে চাই, হয় ব্যষ্টিকে সমষ্টির বিরুদ্ধে লাগাইয়া সমষ্টিকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়া আর না-হয় সমষ্টিকেই বাড়াইয়া ইচ্ছামত কল্পনামত বিচারমত এই সমষ্টিকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত করিয়া। কিন্তু মাঝ-পথের এই চেষ্টা হইতেছে সেই আদি ও আদিমস্তরের সহজ সম্মিলন ও সামঞ্জস্যকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য —তবে আগের সম্মিলন ও সামঞ্জস্য ছিল অজ্ঞানের বা অর্দ্ধ-জ্ঞানের সংস্কারের সঙ্কীর্ণ জিনিষ আর এখন তাহা হইবে সজ্ঞানের নিবিড় বৃহৎ পূর্ণ। প্রথমে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য (thesis) ছিল তাহা ছিল Instinctএর, মাঝে যে ভেদ (antithe-is) হইল তাহা Reasonএর, পরে যে সামঞ্জস্য (synthesis) হইবে তাহা হইতেছে Intuitionএর দিব্য দৃষ্টির।

সমাজ শুধু একটা ব্যবস্থা নয়, কতকগুলি আইনকানুন নয়,

একটা যন্ত্রও নয়—সমাজ হইতেছে একটা সজীব পুরুষ। এই সমষ্টি-পুরুষের প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক ব্যষ্টি-পুরুষের অন্তরাত্মার মণি-কোটায়; ব্যষ্টি-পুরুষ সমষ্টি-পুরুষের অস্তিত্ব বুদ্ধিতে অস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু জীবনে কর্ম্মে তাহার হাত এড়াইতে পারে না। তাই বুঝিতে হইবে উভয়ের মধ্যে আছে একটা নিবিড় সম্বন্ধ, একটা অটুট সামঞ্জস্য। নিজের একান্ত ব্যষ্টিগত সত্তাটুকু ব্যষ্টির আসল সত্তার একটি অংশ মাত্র, অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত; অহং বুদ্ধি জীবের স্বারাজ্য পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতেছে মাত্র। ব্যষ্টির চেতনা যদি আরও উপরে আরও গভীরে বসিয়া যায়, তবে সে দেখে তাহার অহং আর-আর অহং-এর সহিত ওতপ্রোতঃ মিশিয়া আছে, সব অহং মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে একটা বিরাট পুরুষের মধ্যে—ব্যষ্টির জীবের তখনই হয় সাম্রাজ্য সিদ্ধি, ব্যষ্টিগত স্বধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়া সে তখন ফলাইয়া ফুটাইয়া তোলে সমষ্টিগত একটা স্বধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য।

সমষ্টির ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কেবল সর্ব্বসাধারণ নয়, ব্যষ্টির ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুসারে তাহা ছোট বড় নানা কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে একটা বিশেষ ধর্ম্ম বিশেষ কর্ম্ম খেলাইয়া তুলিয়াছে। মানুষ যেমন মানুষের সাথে শুধু একভাবের—মানুষ-ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করে না, পিতা মাতা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু জনে জনে পৃথক পৃথক সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেই রকম মানুষ যে দল বাঁধে তাহাও নানা রকম সমবেত চেতনা ও সত্তা ফুটাইয়া ধরিবার জন্য। মানব-জাতিই (humanity) কেবল সমষ্টিগত সত্তা নয়, দেশ সমাজ

পরিবার আরও কত কত রকমের সমষ্টি-সত্তা আছে। তবে কথা এই, ভিন্ন ভিন্ন যুগে অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টি-সত্তার লীলা হইতে পারে; সেই সমষ্টি সত্তাই কৃত্রিম হইয়া পড়ে যখন তাহার লীলা কাল ফুরাইয়া গিয়াছে, মানুষ শুধু তাহাকে ধরিয়া থাকিতে চায় অভ্যাসের বসে, আইনকানুনের জোরজবরদস্তির সহায়ে—যেন প্রয়োজন সেই সমষ্টিকে ভাঙ্গিয়া নূতন যে সমষ্টি আবিভূত হইতে চাহিতেছে তাহার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, বস্তুতঃ নূতন সমষ্টি যে বাহির হইয়া আসিতে চাহিয়াছে তাহা ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখিয়াই ধরা যায়। ব্যষ্টিগত পুরুষের বিবর্ত্তনের সাথে সাথে সমষ্টিগত পুরুষেরও রূপভেদ হইতেছে, অথবা অন্য দিক দিয়া দেখিলে বলিব, সমষ্টিগত পুরুষের প্রয়োজনের সাথে সাথে ব্যষ্টিগত পুরুষের বিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তবে ব্যষ্টিগত পরিবর্ত্তনটা হয় ক্ষিপ্র, তাহা আগে সহজে চোখে পড়ে; আর সমষ্টিগত পরিবর্ত্তনটা হয় কিছু ধীরে, পরে; তাই ব্যষ্টি যেখানে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, দেখা যায় সমষ্টি তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। এই অসামঞ্জস্যটা যখন অতিমাত্র বেশী হইয়া পড়ে তখনই আসে বিপ্লবের ওলট-পালটের যুগ।

স্বাভাবিক নৈসর্গিক জন-সংহতি বা সমষ্টি ছাড়া কৃত্রিম অস্বাভাবিক জন-সংহতি বা সমষ্টিও যে হইতে পারে না তাহা নহে। যে দল গড়া হয় কেবল বিধিব্যবস্থা আইনকানুন দিয়া, কেবল বাহিরের একটা চাপের ফলে, যাহার ভিতরে একটা একাত্মতা নাই, মানুষের অন্তরাত্মায় যাহার প্রতিষ্ঠা নাই সেই দলই কৃত্রিম

অস্বাভাবিক ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণিকের নিমিত্ত বাহিরের চাপেরই ফলে সেই দলে একটা একত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে, একটা জীবনস্পন্দনই দেখা যাইতে পারে কিন্তু সে একত্বে পৃথক সত্তা জন্মায় না, তাহা নির্ভর করে একান্ত সেই চাপেরই উপর, চাপ সরাইবামাত্র তাহা ধসিয়া পড়ে, আর সে জীবন-স্পন্দন প্রকৃত প্রাণের খেলা নয় তাহা হইতেছে জড়ের সাড়া বা প্রতিক্রিয়া মাত্র। মানুষ যখন কেবল বিচার বুদ্ধি দিয়া চলে, তখনই সে এই রকম অনেক কৃত্রিম সমষ্টি গঠন করে, যাহার সহিত জীবনের একটা নাড়ীর সহজ অব্যর্থ সংযোগ হয় না। কিন্তু তর্ক বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া সে যখন উঠিয়া দাঁড়ায় জ্ঞানের দৃষ্টির স্তরে—অন্তরাত্মার সত্যে ও ঋতে—তখন সে একদিকে যেমন পায় নিজের শাশ্বত সনাতন ব্যষ্টি সত্তা, অন্যদিকে তেমনি চক্রাকারে ফুটাইয়া তোলে শাশ্বত সনাতন সমষ্টি সত্তা— একদিকে স্বারাজ্য আর-একদিকে সাম্রাজ্য।

চাই স্বারাজ্য

স্বরাজ ভাল কথা, কিন্তু স্বারাজ্য আরও ভাল কথা। স্বরাজের জন্য চেষ্টা চলুক, তাহাতে কিছুমাত্র ঢিলা দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু সেই সঙ্গেই স্বারাজ্যের বন্দোবস্তটা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। স্বরাজের উদ্দেশ্য বাহিরটা পরিষ্কার করা, সুযোগ ও সুবিধা আনিয়া দেওয়া; কিন্তু সেই সাথে চাই ভিতরটা পরিষ্কার করা, অন্তঃকরণে নূতন প্রেরণা ও অভিনব শক্তি ফুটাইয়া তোলা। ভিতরটা ঠিকমত গড়ন না পাইলে, বাহিরটার শত পরিবর্ত্তনে ওলট-পালটে বিশেষ কিছু ফল হইবে না। এ কথাটি আজকালকার জগৎ-জোড়া বিপ্লবের মধ্যে আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, জোর করিয়া বলিতে হইবে যে বাহিরের বিধিব্যবস্থার নিয়মকানুনের যতই ভাঙ্গাচুরা গড়াপেটা হউক না কেন, মানুষের স্বভাব যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে সব পণ্ডশ্রম। মানুষের স্বভাবে যদি গলদ থাকিয়া যায়, তবে সে গলদ তাহার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহে ফুটিয়া উঠিবেই। পরাধীন অবস্থায় যদি আমাদের প্রকৃতিতে থাকিয়া যায় অশুদ্ধ জিনিষ সব, তবে স্বাধীন অবস্থায় আসিলে সে সকল যে ভোজবাজির মত দূর হইয়া যাইবে তাহা কেহ মনে করিবেন

না। ইউরোপের দেশ সব দেখুন—সব দেশই ত স্বাধীন। কিন্তু ভিতরের অবস্থা তাদের খুবই কি লোভনীয় বলিয়া বোধ হয়? ভারতবর্ষের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া আমরা অশ্রু ফেলি, সব দোষ দেই পরাধীনতার উপর। কিন্তু স্বাধীন ইংলণ্ডেরই কি অবস্থা আজ, তাহার পরিচয় দিতেছে শ্রমজীবাদের বিদ্রোহ। পরাধীন দেশে দেখি রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ (স্বাধীন দেশে এ সংঘর্ষও আছে), স্বাধীন প্রজাতন্ত্রদেশে দেখি প্রজায় প্রজায় সংঘর্ষ। স্বাধীনতা ও পরাধীনতায় যে তাই বলিয়া কোন পার্থক্য নাই, তাহা নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ দেশের সব লোকের কাছে না হউক অন্ততঃ একটী শ্রেণীর কাছে সুযোগ সুবিধা আনিয়া দেয়, পরাধীন দেশে দেশের কোন লোকই প্রায় সে সুযোগ সুবিধা পায় না। কিন্তু কথা হইতেছে এই, স্বাধীন অবস্থায় স্বরাজে এই সুযোগ ও সুবিধার সম্পূর্ণ ফল পাইব তখনই যখন মনের জগতে একটা স্বাধীনতা স্বারাজ্য আমরা স্থাপন করিতে পারিয়াছি। স্বাধীন হইয়াও ইংলণ্ড জর্ম্মণী রুশিয়া ফরাসী আমেরিকা এমন কি জাপান পর্য্যন্ত যে-সব ব্যাধিতে জরজর হইয়া পড়িয়াছে, সে-সকলের হাত এড়াইতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তুত হইতে হইবে। বিধান বা শাস্ত্র উল্টাইয়া দিলে যে মনটাও উল্টিয়া অন্য রকম হয়, তা নয়। আর মন যদি অন্য রকম না হয়, তবে ব্যবস্থা বদলাইয়া গেলেও কিছু হয় না। ইংরাজীতে ইংলণ্ডের ইতিহাস না পড়িয়া, বাংলায় বাংলার ইতিহাস পড়িলেই তাহাকে জাতীয়শিক্ষা নাম দেওয়া চলে না; সেই

রকম সাদা-রাজের পরিবর্ত্তে কালো-রাজ প্রতিষ্ঠা করিলেই যে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা হইবে তাহাও একটা একান্ত ভুল বিশ্বাস।

মহাত্মা গান্ধীর কাছে তাই একটা জিনিষের জন্য আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ। দেশবাসীর কাছে তিনি চাহিতেছেন যে অহিংসা, তাহার অর্থ তিনি চাহিতেছেন স্বভাবের একটা সংযম ও শুদ্ধি। অন্তরাত্মার বল তিনি যে অর্থে গ্রহণ করেন তাহা আমরা হুবহু গ্রহণ না করিতে পারি,—তাঁহার অন্তরাত্মার বল হয়ত শুধু নৈতিক বল, ঠিক আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাকে হয়ত বলা চলে না—কিন্তু তিনি যে এই গোড়ার কথাটা এমন জোর দিয়া বলিয়াছেন যে আমরা বাহিরের ব্যবস্থা উল্টাইব, বাহিরের শক্তি দিয়া নয়, রাজনীতিকের ছল বল কৌশল দিয়া নয় কিন্তু অন্তরাত্মার বলে, তীব্র বৈরাগ্যের জোরে, তপস্যার চাপে, ইহাই ভারতবাসীর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। আর ঠিক এইজন্যই আমাদের রাজশক্তি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, চেষ্টা করিতেছেন যেন আমরা বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সমান স্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যে-শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই শক্তি লইয়া তাঁহাদের সাথে লড়ি ও পরাভূত হই। ভারতবন্ধু ইউরোপীয়েরা পর্য্যন্ত এই জন্য বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। কর্ণেল ওয়েজউড গান্ধীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন ভারতের গোলমাল মিটিবার নয়, কারণ ভারতবর্ষ যে কেবল ইংলণ্ডের হাত হইতে মুক্তি চায় তা নয়, সে ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে চায়। কর্ণেল

চাই স্বারাজ্য

ওয়েজউড সত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন—ভারতের স্বরাজচেষ্টা শুধু একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, বাহিরের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা নয়, ইহা হইতেছে অন্তরের পরিবর্ত্তনের কথা। প্রাণের তোড়ে দেহের জোরে তর্কবুদ্ধির দাপটে ইউরোপীয় প্রতিভা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে ভারতের অধ্যাত্মপ্রতিভা স্বারাজ্য-শক্তি—মানুষের মধ্যে ভগবানের শান্ত সমাহিত অথচ বিপুল অটুট ঈষণা। ভারতের স্বরাজ সাধনার ইহাই মূল কথা।

দুইটি জিনিষের উপর আমাদের বিশেষ দৃষ্টি এখন দিতে হইবে। প্রথম, স্বভাবের পরিবর্ত্তন অর্থে কি বুঝি, অধ্যাত্ম-শক্তি কাহাকে বলি। স্বভাবের পরিবর্ত্তন অর্থ স্বভাবের আমূল রূপান্তর, অধ্যাত্ম-শক্তি অর্থ মানুষের নিবিড়তম উদারতম সত্তার ঐশ্বর্য্য। মানুষের আছে দুই রকম স্বভাব, একটা হইতেছে প্রাকৃত স্বভাব আর-একটা হইতেছে আত্মিক বা ভাগবত স্বভাব—গীতা যাহাদের নাম দিয়াছেন আসুরী প্রকৃতি আর দৈবী প্রকৃতি। আসুরী প্রকৃতি বা প্রাকৃত স্বভাবটিকেই মানুষের সহজ, নিত্যনৈমিত্তিক, খুব আপনার বলিয়া বোধ হয় আর বস্তুতঃ আমরা দেখি মানুষ সচরাচর ইহারই দ্বারা পরিচালিত; কিন্তু দৈবী প্রকৃতি বা ভাগবত স্বভাবও মানুষের পক্ষে কম আপনার নয় বরং এইটিই মানুষের গভীরতম সত্তার মধ্যে আছে, মানুষ ইহাকেও সহজ নিত্যনৈমিত্তিক করিয়া লইতে পারে। তারপর দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, এই দৈবী প্রকৃতি, ভাগবত স্বভাবকে চিনিয়া বুঝিয়া সম্যক উপলব্ধি করিয়া

জীবনে ফলাইয়া ধরিতে হইবে—মানুষের প্রত্যেক চিন্তা ভাব ও কর্ম্মের লক্ষ্যই হইবে এই নিবিড়তর ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা। আসুরী প্রকৃতি দিয়া স্বরাজলাভ করা যে যাইতে পারে না তাহা নয়। কিন্তু সে স্বরাজ হইবে আসুরিক-স্বরাজ—তাহাতে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অন্যায় অত্যাচার অভাব দৈন্য থাকিবেই, সেখানে যথার্থ স্বাধীনতা যথার্থ সাম্য যথার্থ ঋদ্ধি স্থান পাইবে না। সেইজন্য আমরা যদি সত্য সত্যই স্বরাজপ্রয়াসী হই কায়েন মনসা বাচা, কেবল উত্তেজনার বশে বা বাহিরের একটা খোঁচার ফলে নয়—তবে আমাদিগকে স্বারাজ্য পাইতে হইবে অর্থাৎ দৈবী প্রকৃতি ভাগবত স্বভাব পাইতে হইবে। সমস্যার এই একমাত্র খাঁটি সমাধান, আর সব গোঁজামিল—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এ পথটি যদি মানুষের অগম্য বলিয়া বিবেচনা কর, যদি বল মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্য সাধন, তবে বুঝিতে হইবে মানুষের কোনই আশা নাই, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সব মায়া মরীচিকা। তবে বলিতে হইবে মানুষের শিক্ষার সাধনার কোন অর্থ নাই, মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য নাই।

মানুষ যে দৈবী প্রকৃতি পাইতে পারে না এ রকম বিশ্বাসের অবশ্য যথেষ্ট হেতু আছে। কারণ ব্যক্তিগত হিসাবে যাহাই হউক, সমষ্টি হিসাবে যখনই মানুষ এ সাধনা করিয়াছে তখনই দেখিতে পাই প্রথম প্রথম একটু আধটু সুফল পাওয়া গেলেও অচিরে যথাপূর্ব্বং তথাপরং হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের ইতিহাস একটু দেখিলেই এ কথা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এই

যে বিফলতা ইহার কারণ কি আদর্শের মধ্যে, না সাধনার মধ্যে, না উপায়ের মধ্যে? আমরা বলিতে চাই দোষ আদর্শে নাই, দোষ হইতেছে যে পথে চলা হইয়াছে সেইখানে। প্রথমত দৈবী প্রকৃতিকে যে চাওয়া হইয়াছে তাহা কেবল আসুরী প্রকৃতিকে সংযত করিয়া অর্থাৎ আসুরী প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিয়া, কোন রকমে চাপাচুপি দিয়া যে প্রকৃতিটা পাইয়াছি তাহারই নাম দিয়াছি দৈবী প্রকৃতি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দৈবী প্রকৃতি তাহা নয়, আর শুধু এইটুকু দিয়াই দৈবী প্রকৃতি পাওয়া যায় না। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? চাপা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়া উপরে উপরে একটা সাত্ত্বিকতা বা সাধুভাব—দৈবী প্রকৃতির আভাস পাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সেটা প্রকৃতি নয়, স্বভাব নয়, সেটা নিয়ম দিয়া আইন-কানুন দিয়া প্রকৃতিকে স্বভাবকে বাঁধান মাত্র। দুই রকমে আমরা আসুরী প্রকৃতিকে ঢাকিয়া চাপিয়া রাখিতে পারি, স্বভাবের উপর দৈবী প্রকৃতির একটা ছায়া বা জলুস লাগাইতে পারি। প্রথম, কঠোর ইচ্ছাশক্তির জোরে, তপস্যার তাপে, তীব্র ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা, শিক্ষার সভ্যতার বলের দ্বারা। দ্বিতীয়, একটা চিত্তাবেগ, ভাবোন্মত্ততার দ্বারা। কিন্তু উভয় পন্থাই অনিশ্চিত। কারণ কোনখানেই আসুরী প্রকৃতির গোপন বীজ নষ্ট হয় নাই, সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহা ফুটিয়া ফুলিয়া উঠিবে। চাই আসুরী প্রকৃতির রূপান্তর, সমস্ত আধারের একটা নির্ম্মল টলটল শুদ্ধির উপরতম স্তর হইতে নিম্নতর স্তর পর্য্যন্ত একটা প্রসাদগুণাত্মক স্থির সমতা। এ জিনিষ জোর করিয়া হয় না, সহজ ভাবাবেগেও

হয় না। এ জন্য চাই নিবিড় জ্ঞানের, অন্তরাত্মার জাগরণের ক্রমবিকাশ, আধারের মধ্যে ক্রমবিস্তার। ইচ্ছা শক্তি ও ভাবাবেগ সহায় হইতে পারে, কিন্তু ও দুটি ছাড়া চাই ভিতরে একটা পূর্ণব্রহ্মের অনুভূতি, এবং তাহারই প্রেরণায় অঙ্গের একটা ধীর রূপান্তর।

যম নিয়ম অহিংসা অস্তেয় স্বাধ্যায় দ্বারা নৈতিক মানুষ পাওয়া যাইতে পারে, প্রেম ভক্তি দ্বারা সাধু মানুষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন দিব্য মানুষ; দিব্য মানুষের সম্ভাবনা হইবে তখনই যখন মানুষ দাঁড়াইবে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর, পাইবে গীতার "ব্রাহ্মীস্থিতি"। সুস্থ অখণ্ড সহজ স্বাভাবিক মানুষ, অথচ হইয়া উঠিব দিব্য মানুষ— এইরূপ লক্ষ্য হইলে যে সাধনা যে ক্রিয়া যে পথ মানুষকে একবগ্‌গা, একদিক ভারী, অস্বাভাবিক করিয়া ফেলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। মনের বা চিত্তের কসরৎ ছাড়িয়া দিতে হইবে; সমস্ত আধারকে সহজ ছন্দে দুলাইয়া দিতে হইবে, ও সেই ভাবেই তুলিয়া ধরিতে হইবে একটা উচ্চতর গ্রামে অর্থাৎ মনের চিত্তের কোন বিশেষ ধারার মধ্যে চালিয়া নয়, অন্তরাত্মার পূর্ণ বিস্তৃতির মধ্যে মানুষকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে।

অন্তরাত্মার বল

(Soul Force)

বুদ্ধদেব বলিতেছেন—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥

শত্রুভাবকে কখন শত্রুভাব দিয়া জয় করা যায় না, শত্রুভাবকে মিত্রভাব দিয়াই জয় করিতে হয়—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

খৃষ্টও বলিতেছেন, "Resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also."—অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে যাইও না, এক গালে কেহ যদি তোমায় চপেটাঘাত করে, আর গালটি পাতিয়া দিও।

বৈষ্ণব প্রভু বলিতেছেন—

মেরেছ মেরেছ কলসী কাণা।
তাই বলে কি প্রেম দিব না॥

বুঝিলাম কথাটা। কিন্তু তবে এ আবার কি দেখি? কৃষ্ণের মুখে এ কি ভৈরব বাণী—

বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং সম্ভবামি যুগে যুগে * *
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ—

এমন কি খৃষ্টও জলদগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন,—"I come not to sow peace, but discord."—শান্তির নয়, আমি আসিয়াছি কলহের বীজবপন করিতে—

"I come not to send peace, but a sword."—শান্তি বিতরণ করিতে আমি আসি নাই, আমি আসিয়াছি অসি বিতরণ করিতে।

শুধু কথায় নয়, কার্য্যতঃও খৃষ্ট পশুবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, স্বহস্তে চাবুক চালাইয়াছিলেন। বলা যাইতে পারে, এ সব হইতেছে ভগবানের কথা, মানুষের কথা নয়। দণ্ডবিধান ভগবানেরই কাজ—Vengeance is Mine! মানুষের কাজ অহিংসা। কিন্তু ভগবান ত শূন্যে শূন্যে কিছু করেন না, তাঁহারই একটা সৃষ্ট পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তবে তাঁহার কার্য্য তিনি করেন। ধ্বংসের কাজ করিতে হইলে তিনি প্রাকৃতিক শক্তিকে আশ্রয় করেন, আবার মানুষরূপও আশ্রয় করেন। দণ্ডদাতা মানুষের মধ্যেই তিনি দণ্ড দণ্ডোদময়তামস্মি। ভগবান দণ্ডদাতা বলিয়া মানুষ যে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে এমন নয়। তাই ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ক্লৈব্য কার্পণ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে উত্তেজিত উৎসাহান্বিত করিতেছেন, বলিতেছেন—

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি

"যুদ্ধ কর তবে, এতে তোমার কোন পাপ হইবে না"—

ময়ৈবেতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব।

নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্।

কারণ, "ইহাদিগকে ত পূর্ব্ব হইতেই আমি মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র হইবে"।

এখন তবে এ মহাসমস্যার মীমাংসা কি ? কথাটা আমরা বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। বৈরীকে বৈরভাব দিয়া শান্ত করা যায় না। আমার মনে যদি থাকে শত্রুভাব, তবে শত্রুর মনে সে ভাব গিয়া ধাক্কা দিবে, সেখানে তুলিবে শত্রুভাবেরই তরঙ্গ ; যে লাঠি দিয়া আঘাত করে, সহজ প্রতিক্রিয়া বশে আমি যদি তার বিরুদ্ধে লাঠি চালাই,তবে সে-ও আবার লাঠি চালাইবে—উভয় পক্ষ এইরূপে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দোল খাইতে থাকিবে, ইহার আর শেষ হইবে না। কিন্তু একপক্ষ যদি প্রশান্ত-ভাব না অবলম্বন করে, তবে অপরপক্ষও চেতিয়া উঠিবার সুযোগ আশ্রয় বা সাড়া পাইবে না। এ কথাটি আরও সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ, শত্রুভাবের বহিঃচেষ্টা হইতেই বিরত হইলে চলিবে না ; হাত পা আমার নিশ্চল হইল, কিন্তু প্রাণ মন গুমরাইয়া মরিতে লাগিল তাহাতে ফল দিবে না। কারণ মনে প্রাণে যতক্ষণ বিক্ষোভ আছে ততক্ষণ তাহা অপরের মনে প্রাণে গিয়া পৌঁছিবে, আর সেখানে যে প্রতিক্রিয়া হইবে তাহার প্রকাশ শুধু মনে প্রাণে না হইয়া, বাহিরের অঙ্গ চেষ্টার মধ্য দিয়াও হইতে পারে। মন প্রাণ হইতে শত্রুভাবের বীজ পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিতে

হইবে, তবেই সে মনের প্রাণের কোন রকম প্রতিক্রিয়া হইবে না। মনে প্রাণে শত্রুভাব রাখিয়া তাহা যত ক্ষীণ হউক না কেন—শুধু তদনুরূপ বাহিরের কাজ হইতে বিরত হইলে, তাহাকে বলে মিথ্যাচার—

কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

সুতরাং যেখানে ভয় পাইয়া অথবা সামর্থ্য নাই বলিয়া অথবা কৌশলের দোহাই দিয়া প্রতীকার করি না প্রতিশোধ লই না সেখানে আমার সে মিথ্যাচার নিরর্থক, কারণ শত্রু তাহাতে ভুলিবে না, কারণ মানুষের চোখে ধূলা দেওয়া যত সহজ তাহার প্রাণে ধূলা দেওয়া তত সহজ নয়। যেখানে Non-violence প্রচার করিতে মুষ্টি আপনা হইতেই দৃঢ়বদ্ধ, চক্ষু আরক্ত, কণ্ঠ ঘনগর্জ্জিত হইয়া আসিতেছে (এ রকম দৃশ্য একটি আমাদের নিজের চক্ষে দেখা) সেখানে প্রাণের সহজ গতিকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা যে কতদূর মিথ্যা, কতখানি বিফল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বোপরি চাই মনের প্রাণের সাম্য ভাব, অন্তরাত্মার প্রশান্ত সাহস সহিষ্ণুতা। অহিংসা আমার অন্তরাত্মার সত্যধর্ম্ম হইয়া উঠা চাই, তবেই সে জিনিষটি যাহাকে শত্রু বলি তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইতে পারিবে।

এখন দ্বিতীয় কথা এই, বাস্তবিক এইরূপ ঘটে কি না। আমি শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া মিত্রভাব ধরিলে আমার শত্রুও যে মিত্রভাব ধরিবে এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে। উত্তরে বলা যাইতে পারে,

এই রকম সন্দেহ হয় বলিয়াই বাস্তবে ঘটিয়া উঠে না, মনে আমার যতক্ষণ এই রকম সন্দেহ আছে তাহার অর্থ ততক্ষণ আমার প্রাণে শত্রুভাবের আছে একটা বীজ, আর সে বীজের বিষময় ফল ত হইবেই। কিন্তু এ কথা ছাড়িয়া দিলেও, কার্য্যতঃ এ সত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, যুক্তি বা জ্ঞান ইহার সমর্থন করে কি না তাহা দেখিবার বিষয়। আমার স্বভাব যেন বিশুদ্ধ হইল, কিন্তু অপর পক্ষেরও আছে একটা স্বভাব বা স্বধর্ম্ম। আমি সাধু কাহারও কিছু চুরি করি না, তাই বলিয়া চোরে আমার বাড়ীতে চুরি করিতে বিরত হইবে? স্বভাব যাহার হিংসাপরায়ণ সে ত হিংসাই করিবে, আমার অহিংসায় তাহার কি যাইবে আসিবে? আমি তাহার মনে কোন প্রতিক্রিয়া জন্মাইবার কোন অজুহাত না দিতে পারি, কিন্তু সে অজুহাতের অপেক্ষা সে আমার কাছে রাখে না, তাহার নিজের স্বভাবের ভিতরেই তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

চরম অহিংসাবাদের দিক হইতে এ কথার উত্তর যে নাই, তাহা নয়। অহিংসাবাদের মূল ভিত্তি হইতেছে এইখানে যে, কোন মানুষ একেবারে খারাপ হইতে পারে না, হাজার পাপী হউক দুঃশীল হউক মানুষের মধ্যে আছে এমন একটি গুপ্তস্থান যাহা কখন মলিন কখন দুষ্ট হইতে পারে না, যেখানে স্পর্শ করিতে পারিলে ভাল জিনিষ ছাড়া খারাপ জিনিষ বাহির হয় না। চোর সাধুর বাড়ীতে চুরি করিতে পারিবে না, যদি একবার সে অনুভব করে সেই সাধুর সাধুত্ব। এইটুকু বুঝিতে হইবে, যে অজানিতে সংস্কার বশতঃ পাপী

ধর্ম্মাত্মার উপর অন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে অভ্যাসের পথে সে চলিয়াছে, ধর্ম্মাত্মার স্বচ্ছ অন্তরাত্মা ছিল তখন নিষ্ক্রিয়, ভাল বা মন্দ কোন প্রতিবন্ধকই দেয় নাই। কিন্তু অন্তরাত্মার ধর্ম্ম অভাবাত্মক (negative) জিনিষ নয়, সে শুধু নিষ্ক্রিয়ই থাকে না, তাহার আছে একটা শক্তি, সে মন্দের প্রতিষেধকরূপে মন্দের বিপরীত দিক হইতে তুলিয়া চালাইয়া দেয় একটা ভালর তরঙ্গ—ইহারই নাম ত অন্তরাত্মার বল। এই অন্তরাত্মার বলের অনুভব পাইলে, অতি ঘোর পাপীরও স্বভাব প্রতিহত হইয়া যায়। লে মিজেরাবল (Les Miserables) গ্রন্থে ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই। জিন ভালজিন কারাগার হইতে ফিরিয়া সমাজের আচার ব্যবহার সমানরূপে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দেখিতে পাইল আর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিল, এই প্রতি-শোধের প্রথম পাত্র হইলেন পরম সাধু ধর্ম্মাত্মা বেনভেনুতো মীরিয়েল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জিন ভালজিনের হিংসাপরায়ণ প্রাণ সেই মহাপুরুষের অন্তরাত্মার স্পর্শ পাইল সেই মুহূর্ত্তে তাহারও অন্তরাত্মার কি একটা অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়া গেল। শুধু তাই নয়, মানুষ ত দূরস্থান, বনের পশুও এই অন্তরাত্মার বলের কাছে মাথা নত করে। শ্বাপদসঙ্কুল বিষধর পরিপূর্ণ অরণ্যে মুনিঋষিগণ যে কি রকম নিরাপদে বসবাস করিতেন সেই সব ইতিকথা এই সত্যটিই প্রমাণিত করে না কি?

প্রতিপক্ষের দিক হইতে প্রত্যুত্তরে এই বলা যায় যে, এই রকম অন্তরাত্মার বল দিয়া দুষ্টের স্বধর্ম্মকে আমি নিরোধ (inhibit)

করি মাত্র, তাহার স্বভাবকে একেবারে বদলাইয়া দেই না, যাহা করি সেটা হইতেছে সাময়িক স্তম্ভন—আমার দিক দিয়া সে স্বভাব ও স্বধর্ম্ম ফাটিয়া বাহির হইবেই। এমন কি জিন ভালজিনও মহাপুরুষের স্পর্শের পরেও দুঃখী বালকটির পয়সা কাড়িয়া লইবার ঝোঁক সম্বরণ করিতে পারে নাই; তবুও ত জিন ভালজিন আসলে পাপী ছিল না, তাহার অন্তঃকরণ স্বভাবতই ছিল বিশুদ্ধ, যে ময়লা ধরিয়াছিল সেটা খুব বাহিরে বাহিরে, ঘটনা চক্রের অবস্থার তাড়নার চাপে।

তারপর আর একটি কথা, আমার একলার স্বভাব বিশুদ্ধ হইলেই হয় না, আর সকলের স্বভাব কি রকম সেটাও গণনা করিতে হয়; ব্যষ্টিগত হিসাবে যাহাই হউক না, সেই ব্যষ্টি সমষ্টির ধর্ম্ম অনুসারে সমষ্টির ট্যাক্স না দিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের মধ্যে থাকিলে অন্তরাত্মার বল সত্ত্বেও সাধু যে নিগৃহীত হন না, একের অন্তরাত্মার বল যে সকলের পশুবলের কাছে বিফল হইয়া যায় না, বাস্তবে সব সময়ে তাহার প্রমাণ পাই কি? সমাজের অসাধুত্বের প্রায়শ্চিত্ত কেবল যে অসাধুকেই করিতে হয় তাহা নয়, সাধুকেও অনেক সময়ে করিতে হয়—বিশেষতঃ যে সাধু জীবনের সাধক, যাঁহার লক্ষ্য ব্যক্তিগত মোক্ষ বা নির্ব্বাণ নয়, পরন্তু যাঁহার কাজ সমাজের ভিতরে সমাজকে লইয়া।

অসাধুর পাপের ভার তাই সাধুকে লইতে হয়—পাপীর স্বভাবের জের ধর্ম্মাত্মাকে টানিতে হয়। তবে পার্থক্য এই একের যাহা সত্য, অপরের তাহা আরোপ; একের যাহা প্রয়োজন অপরের

তাহা ঐশ্বর্য্য। কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করিতে হয়, বিষ দিয়া বিষ ক্ষয় করিতে হয়, কিন্তু এক পক্ষে কাঁটা বিষ হইতেছে আধারের অঙ্গীভূত জিনিষ, আর এক পক্ষে তাহা শুধু ব্যবহার্য্য অস্ত্র বা যন্ত্র। এক পক্ষে রিপুর দাস আমি আর-এক পক্ষে রিপুর প্রভু আমি। রিপু জয় হইতেছে ভিতরের কথা, ভিতরের সংস্কার হইতে মুক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরে সে রিপুর অঙ্গলীলা পর্য্যন্ত যে লোপ পাইয়া যাইবে এমন কোন প্রয়োজন নাই। রামকৃষ্ণও তাই বলিতেন "সাধু হয়েছিস্ বলে বোকা হবি কেন? ছোবল দিতে তোকে বারণ করি কিন্তু ফোঁস করতে ত বারণ করি নি।" খৃষ্টও কতকটা সেই ধরণের কথা এক জায়গায় বলিয়াছেন—"Be ye wise as serpents and harmless as doves." গীতাকার খৃষ্ট বা রামকৃষ্ণকে যে ছাড়াইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাদের কথারই জের মাত্র এরূপ বলিলে খুব বেশী ভুল হয় না।

অসাধুর প্রকৃতিকে শুধু নিরোধ করিলেই হয় না, তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। অসাধুভাব হইতে নিবৃত্তিই যথেষ্ট নয়, অসাধুভাবের পরিবর্ত্তে সাধুভাব জন্মাইতে হইবে। সাধুর স্পর্শ একটা সহায় হইতে পারে, খুব একটা বিশেষ সহায়ই হইতে পারে, কিন্তু তবুও তাহা সহায় মাত্র; অসাধুর নিজের অন্তরাত্মার ভিতরে জাগরণ চাই, তাহার দিক হইতেও একটা সম্মতি একটা চেষ্টা একটা সঙ্কল্প একটা তপঃ প্রয়োগ চাই। নতুবা তাহার স্বভাব পাকাপাকি বদলাইবে না। সাধুর অন্তরাত্মা অসাধুর অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিল সেখানে ফেলিল নূতন জীবনের বীজ,

কিন্তু সেই অন্তরাত্মার বীজ মনে প্রাণে দেহে অঙ্কুরিত মুঞ্জরিত হইয়া উঠা দরকার; অন্তরাত্মায় সাধুসঙ্কল্প জাগিতে পারে কিন্তু স্থূলতর আধারে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তোলাই ত কঠিন, তাই ত কত সময় চক্ষের জল ফেলিয়া বলিতে হয়—The Spirit is willing but the flesh is weak. অন্তরাত্মা ক্রমে ক্রমে তাহার প্রভাব স্থূল আধার fleshএর উপর বিস্তারিত করে, সত্য কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে স্থূল আধারেরও নিজের চাই একটা সাধনা। আর স্থূল জিনিষের প্রয়োজন ত স্থূল সাধনা। যোগীরা যে ঘোর কৃচ্ছু সাধনা করিতেন, শুধু ধ্যান ধারণা নয় সেই সঙ্গে ছিল যম নিয়ম, আবার যম নিয়মও শুধু নয়, ছিল শরীর পীড়ন। শুদ্ধিসাধনা জিনিষটার মধ্যেই আছে একটা পীড়ন বা violence, তবে যে-জিনিষটা শুদ্ধ করিতে চাই সেটা যত সূক্ষ্ম, পীড়নটাও তত সূক্ষ্ম, আবার তাহা যত স্থূল পীড়নটাও তত স্থূল—এ শুধু মাত্রার কথা। এখন এই যে পীড়নটা সেটা নিজে নিজে দেওয়া হউক কিম্বা অপরের নিকট হইতে পাওয়া হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না অর্থাৎ তাহার ফল বা উদ্দেশ্য যদি হয় শুদ্ধি। দেবতা যদি অসুরকে পীড়ন করেন তবে তাহা হিংসাপরবশ হইয়া নয়, দেবতার অন্তরাত্মায় বা প্রাণে মনে দেহে হিংসার সংস্কার নাই, তিনি করেন শুধু হিংসার কর্ম্মটি বাহ্য অঙ্গ চেষ্টাটি—গীতার কথায়, কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্, অসুরের স্বভাবশুদ্ধির জন্য। অসুরের আধার যদি এমনি শক্ত কঠিন হয় যে তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই হয়; কিন্তু তাহাতে অসুরের অন্তরাত্মা ধ্বংস

হয় না, অসুরের অসুরত্বটুকু নষ্ট করিবার সুবিধা হয় শুধু—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। খাঁটি অহিংসাবাদের অর্থ এমন নয় যে শরীরের হিংসা করিবে না, তাহার অর্থ মনে প্রাণে হিংসার যে ভাব যে তরঙ্গ তাহা রাখিবে না, অন্তরাত্মায় হিংসা নাই, অন্তরাত্মায় আছে শুধু প্রেম বা একাত্মতা। অন্তরাত্মার বলের অর্থ এমন নয় যে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইলে ন্যায়তঃ কথাবন্ধ করিয়াও বসিয়া থাকিতে হয়। কেবল মাংসপেশীর প্রয়োগ হিংসা, বাক্য প্রয়োগ হিংসা নয়, ইহা অতি স্থূলবুদ্ধির কথা। মুখে যাহাকে শয়তান বলিতে পারি, হাত দিয়া তাহাকে দু'ঘা দিলেই সব আধ্যাত্মিক যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল, এ রকম সাধনা কষ্ট কল্পনা মাত্র।

আসল কথা আমাদের এই বলিয়া মনে হয় যে আধ্যাত্মিক বা অন্তরাত্মার বল আর আদিভৌতিক বা পশুবল বলিয়া যে দুইটি শক্তি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়, তাহা সব সময় ঠিক নয়। উভয়ের মধ্যে যে একান্ত পার্থক্যের দাঁড়ি টানিয়া দেওয়া হয় সেটা কৃত্রিম জিনিষ, এখানেও দেখি সেই পুরাতন আদর্শের ছায়াপাত, ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা, আত্মাই কাজের শরীরটা বাজে। আমরা পশুবলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি না। আমরা বলিতেছি পশু যখন কেবলই পশু তখনই তাহা হেয়, কিন্তু এই পশুই ত হইতে পারে আবার দেবতার বাহন। আমরা এমনও বিশ্বাস করি যে একদিন হয়ত মানুষ আর পশুবল প্রয়োগ করিবে না, কিন্তু তার কারণ এমন নয় যে পশুবলটা খারাপ হীন, তার কারণ এই যে

ও-জিনিষটার প্রয়োজন থাকিবে না। বিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্‌যাপনের জন্য প্রাণীর এক একটি অঙ্গের আর প্রয়োজন থাকে না, তাহা তখন আপনা আপনিই মরিয়া যায়, সেই রকম পশুবলও একটা নূতন আবহাওয়ায় নূতন ধর্ম্ম কর্ম্মে কোন স্থান না'ও পাইতে পারে। কিন্তু কোন অঙ্গ লুপ্ত হইলেই বলি কি সেটা কুৎসিত হেয় জঘন্য ছিল, না, ছিল না সেটি জীবনেরই অভিব্যক্তি? সেই রকম মানুষের পশুবল যে কুৎসিত জঘন্য হেয়, তাহার অন্তরাত্মার বলেরই অভিব্যক্তি হইতে পারে না, তাহা নয়। মানুষের পশুবল মানুষের যোগ্য নয় তখনই যখন সে তাহাকে ব্যবহার করে পশুভাবে প্রণোদিত হইয়া; মানুষের পশুবল মানুষের অযোগ্য নয় যদি তাহাকে ব্যবহার করা যায় প্রকৃত মানুষ-ভাবে প্রণোদিত হইয়া। মানুষেরও আছে পশুর শরীর, সুতরাং বাহিরের কর্ম্ম এক হইতে পারে, আসল পার্থক্য ভিতরে, সেখানে মানুষের আছে অন্তরাত্মার চেতনা, পশুর আছে অজ্ঞান অন্ধকার। গীতার সমস্ত রহস্যই এই কথায়—অজ্ঞানী আসক্ত হইয়া যে কর্ম্ম করে, জ্ঞানী অনাসক্ত হইয়া সেই কাজই করিতে পারেন।

বর্ত্তমানের সমস্যা

জগৎটা যে বড়ই খাপছাড়া—out of joints হইয়া পড়িয়াছে—সে বিষয়ে আজকাল বোধ হয় আর দুই মত নাই। কোথাকার কি যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খিল ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে, সব গোলমাল এলোমেলো অবস্থায়। মানুষের জীবন কোন দিনই একেবারে নির্দ্দোষ ছিল কিনা সন্দেহ, অনেকখানেই হয়ত জোড়াতালি চাপাচুপি রফারফি ছিল; তবুও মোটের উপর একটা বেশ দৃঢ় বাঁধন নিবিড় শৃঙ্খলা পাওয়া যাইত। কিন্তু এমন স্পষ্ট বেসুরা বেতালা অবস্থায় মানুষ বোধ হয় এই প্রথম পড়িয়াছে। সুখ সে হয়ত কোন দিনই পায় নাই, আজ কিন্তু সে স্বস্তিকে পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে। পাশ্চত্য বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগে অ-ধাতস্থ লোকের (unstable mind বা neurotics) সাদা কথায়, পাগলের—ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এমন কোন দিনই ছিল না। শেষ পাগলামীর যুগ গিয়াছে, ইউ-রোপে ফরাসী বিপ্লবের যুগ। কিন্তু তখন বায়ুদেবতার কৃপা হইয়াছিল বিশেষভাবে ফরাসী দেশের উপর—আজকাল সমস্ত জগৎ ভরিয়া তাহার ওলট-পালট চলিতেছে।

বলা যাইতে পারে, নূতন সৃষ্টির নূতন শৃঙ্খলার এই হইতেছে পূর্ব্বাভাষ। কিন্তু তাই মনে করিয়াই ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। গাছ বা পাথর বা পশু নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মানুষের ধর্ম্ম হইতেছে সজ্ঞানে সৃষ্টির কাজে সহায়তা করা—এইটি সে যতখানি করিতে পারিবে ততখানিই তাহার সার্থকতা। সুতরাং আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, এই সঙ্কটাবস্থায় কি করা মানুষের উচিত, কি না করিলে হয়ত নূতন সৃষ্টির নূতন শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে জগতে ঘটিবে শুধু প্রলয়, আত্যন্তিক বিনাশ।

জগতের কলটা বিগড়াইয়া গিয়াছে—এটাকে সারিতে হইবে। অনেকে তাই নজর দিয়াছেন, নেহাৎই কলকজার দিকে,—বাঁধন গুলি আটিয়া দাও, পেরেকগুলি কসিয়া দাও, ভাঙ্গা মরিচাধরা পুরাণ যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তে নূতন যন্ত্রপাতি বসাও। অর্থাৎ আইন-কানুন করিয়া, বিধিনিষেধ দিয়া বাহিরের কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার কর, নূতন ব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলিয়া দাও। সুশৃঙ্খলার ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সভা সমিতি কর, কর্ত্তব্যের নিয়মাবলী বাঁধিয়া দাও, কার্য্যের ভাগবাটরা কর, দায় ও দাবির যথাযথ পরিমাণটা মাপিয়া জুখিয়া ঠিক করিয়া ফেল। তাই সমাজের মানুষ-জীবনের কত রকম ছক আঁকিয়া, system তৈয়ার করিয়া যে সম্মুখে ধরা হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ চৌদ্দটি সূত্রে জগতের দিব্যযুগের চমৎকার একটি প্ল্যান করিয়া দিলেন। বোল্‌-শেভিকেরা তাহাদের ব্যবস্থাপকদের নির্দ্দেশ অনুসারে ভয়ানক

জোরে মানুষকে নূতন একটা যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া ঢালাই করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আমাদের দেশেও বলা হইতেছে, একটা গবর্ণমেণ্ট বা শাসনযন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই ভারতবর্ষের সকল গোলমাল সকল সমস্যা চুকিয়া যাইবে।

কিন্তু এ কথাটা বুঝা কি এতই কঠিন, সব নিয়মাবলীই যে চোথা কাগজের টুকরা—a scrap of paper ? আইনকানুনের এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ শক্তি নাই, যাহার বলে সে আপনা আপনিই কার্য্যে পরিণত হইয়া যাইবে; জোর জবরদস্তি করিলেও ব্যবস্থা অনুসারে যে অবস্থা হইবে, হইলেও যে টিকিয়া থাকিবে এমন নিশ্চয়তা কিছু মাত্র নাই। লেফাফা দোরস্ত যতই থাকুক না কেন, মানুষের কাজ হইবে তাহার ভিতরটা যেমন সেই অনুসারে, ভিতরের প্রয়োজন অনুসারে মানুষ যন্ত্র গড়িয়া লইবে, বাহির হইতে দেওয়া কোন যন্ত্র সে ব্যবহার করিতে চাহিবে না, চাহিলেও পারিবে না। ভিতরটা যাহার দস্যু ভাবাপন্ন, সে-মানুষের হাতে সাধুর দণ্ডকমণ্ডলু তুলিয়া দিলে কি হইবে? কমণ্ডলুতে সে বিষ গুলিবে, দণ্ড দিয়া মাথা ফাটাইবে।

জগৎটা, মানুষের জীবনটা দুঃস্থ পীড়িত। সুতরাং প্রতিকার চাই জগতের কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে নয়, বাহিরের জীবনে নয়, প্রতিকার চাই মানুষের নিজের অন্তরে। মানুষকে ভিতরে ভিতরে শুদ্ধি ও স্বাস্থ্য পাইতে হইবে, তবেই বাহিরে শুদ্ধি ও স্বাস্থ্য দেখা দিবে। তাই অনেক মহাপুরুষ কবি শিল্পী বলিতেছেন, মনটাকে আগে বদলাও—মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা—সকল ধর্ম্মের আগে আগে চলিয়াছে

মন, মনের গড়ন যেমন ধর্ম্মেরও গড়ন তেমনি হইয়া উঠে। কর্ম্মের পরিবর্ত্তনের আগে চাই ভাবের পরিবর্ত্তন, ভাবের পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে কর্ম্মের পরিবর্ত্তন—মনের, ভাবের পরিবর্ত্তনের পরে কর্ম্মের পরিবর্ত্তন সহজ, পূর্ব্বে একেবারে অসাধ্য।

এখন, এই মনের বা ভাবের পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? মানুষের ধারণা হইবে অন্য রকমের, তাহার চিন্তা চলিবে নূতন স্রোতে। মানুষ কেবল নিজের কথা ভাবিবে না, ভাবিবে দেশের দশের কথা; মানুষ কেবল স্বার্থ দেখিবে না, লাভ দেখিবে না, দেখিবে পরার্থ, দেখিবে কল্যাণ; মানুষ খুঁজিবে আদর্শ, উচ্চতর উদারতর সত্য। মানুষের চিন্তা-জগতে পরিবর্ত্তন চাই, তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে, সেখানে ফুটিয়া উঠিবে স্থূলজগতের পাশব প্রকৃতির ছায়া নয়, পরন্তু একটা সূক্ষ্মজগতের একটা দিব্য প্রকৃতির আলো। ঠিক কথা, কিন্তু ইহাকেই যথেষ্ট বিবেচনা করিলে বিষম ভুল হইবে। এই ভুল আমরা পদে পদে করিয়াছি ও করিতেছি—ইহার সংশোধন চাই।

আধুনিক যুগে জর্ম্মণ দেশে চিন্তাশক্তির যেমন পরিচয় পাইয়াছি, আদর্শের প্রাদুর্ভাব সেখানে যেমন হইয়াছে, এমন কোথাও আর হয় নাই। সারা ইউরোপ ত তাহার শিক্ষাদীক্ষায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু এই ইউরোপেই আবার যুদ্ধের সময় জর্ম্মণীর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। মনের পরিবর্ত্তনে চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় না, চিত্তের উপর একটা ভাসা ভাসা জলুস দিয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চাপে তাহা উপিয়া যায়, স্বভাবের স্বরূপ

তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। চিত্তের সংস্কারের বিরুদ্ধে মনের ভাব বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে না, বরং সাক্ষাতে না হউক লুকাইয়া মন চিত্তের ধারা অনুসারেই চলে, রকম ফের দিয়া চিত্তেরই খোরাক জুটাইতে থাকে। Intellectualistএরা, ধর্ম্মপ্রচারকেরা এই কথাটায় তেমন আমল দেন নাই বলিয়াই তাঁহারা মানুষের প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করেন নাই।

বুদ্ধির বিকৃতি তত দোষের নয়, যত দোষের হইতেছে চিত্তের বিকৃতি। বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সাথে বিশেষ ভাবে শুদ্ধ করিতে হইবে চিত্তকে। অর্থাৎ আদর্শকে, সত্যকে, মঙ্গলকে শুধু বুঝিলে চলিবে না, স্বীকার করিলে চলিবে না; তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহাতে অনুরক্ত হইতে হইবে—তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রেমের রসে সত্যকে যতদিন অভিসিক্ত করা হয় নাই, আনন্দে যতদিন আদর্শ সজীব সবুজ হইয়া উঠে নাই, ততদিন সে সত্য সে আদর্শ সুন্দর হয় নাই স্বভাবের মুখ ফিরাইতে পারে নাই, জীবন-গতির মধ্যে নূতন টান বহাইতে পারে নাই। বুঝিয়াছি যাহা তাহাকে ভালবাসিতে হইবে মস্তিষ্কে যাহা নীরস, চিত্তে তাহাকে সরস করিয়া ধরিতে হইবে—নতুবা তাহা কার্য্যোপযোগী হইবে না, নতুবা পরিশেষে দেখিব—

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে!

এখানেও তবু শেষ নয়। মনের ভাব প্রথমে দরকার, তার পর মনের ভাবকে চিত্তের ভাবুকতায় পরিণত করিতে হইবে, তবুও

কিন্তু সত্য স্থির জাগ্রত নিরেট অটুট হইয়া দেখা দেয় না। আমাদিগকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে—চিত্তের পরে প্রাণে অথবা ঠিক করিয়া বলিতে গেলে শরীর-ঘেঁষা প্রাণের স্তরে পৌঁছিতে হইবে। জগতে কত আন্দোলন কত movement হইয়াছে—ধর্ম্মের আন্দোলন সমাজের আন্দোলন; কিন্তু কিছুই ত তেমন স্থায়ী হয় নাই। মনের ভাব বা চিন্তামাত্র লইয়া নয়, চিত্তের (ও প্রাণের উপরের স্তরের) আবেগ লইয়াই ত কত মহান্ আদর্শ জগতে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। কোনটা একেবারে বিফল হয় নাই, প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু নবজীবনের পলিমাটি ফেলিয়া গিয়াছে, সত্য কথা। কিন্তু প্রয়াসের তুলনায় ফল, আশার তুলনায় লাভ, উচ্ছ্বাসের তুলনায় বস্তু কতটুকু পাওয়া গিয়াছে? লোকে যে জগতের মানব জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রদ্ধালু হইতে পারে না, আস্তিক হইতে পারে না, তাহার কারণই এইখানে।

বস্তুতঃ জগতে শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে কোন্ শক্তি, পরিণামে কাহার জয় অবধারিত? প্রকৃতিং যান্তিভূতানি—এই প্রকৃতির অন্য নাম প্রাণের ধর্ম্ম। চিত্ত হইতেছে সাধারণ ভাণ্ডার। সকল জিনিষের বীজ সেখানে, সকল জিনিষের রস সেখানে। কিন্তু জিনিষ যে বিশেষ রূপ পাইতেছে, যে নিয়মে গড়িয়া উঠিতেছে চলিতেছে, যে ভঙ্গীতে কার্য্যে ফলিত হইতেছে তাহা সব দিতেছে প্রাণের শক্তি হতাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্। চিত্ত রঙ দিতে পারে কিন্তু আকার দিতেছে প্রাণ। চিত্তের সংস্কারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু এই সংস্কারের মূলে

রহিয়াছে যে আদি মৌলিকশক্তি তাহা প্রাণের শক্তি। সত্যকে বুঝিবার সত্যকে ভালবাসিবার আগে সত্যকে পাওয়া চাই। কোথায় সত্য? মানুষের কাছে নিবিড়তম নিকটতম সত্যতম সত্য হইতেছে প্রাণের সত্য। প্রাণের প্রকৃতির যে প্রতিমা তাহার উপর মানুষ অনুরক্ত, মানুষ তাহাকেই ভাল বুঝে, কার্য্যে অন্ততঃ তাহাকেই ফলাইয়া চলে।

প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেহ অস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং
স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি।

ইউরোপীয় চিন্তা জগতেও আজকাল এই প্রাণের কথাটাই খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তর্কবুদ্ধির বন্ধ্যাত্ব, ভাবালুতার পঙ্গুত্ব দেখিয়া সেখানকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন আসল সত্য হইতেছে Vital planeএর সত্য, Physico-biological laws—সৃষ্টির মধ্যে বিবর্ত্তন, মানুষের মধ্যে রূপান্তর চলিতেছে এই প্রাণের ধর্ম্মকে ধরিয়া, ঘিরিয়া। এই ধর্ম্ম অটুট অব্যর্থ, ইহাকে কাটাইয়া চলিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ মানুষের স্বভাব গড়িয়া উঠিয়াছে ইহারই নিয়ম অনুসারে। মানুষের হৃদয়, মানুষের মন এই বস্তুটিরই ফুল লতা পাতা, এখানে যে সব প্রেরণা আছে তাহাদেরই সার্থকতার বহু বিচিত্র উপায়; এই সত্যটির সহিত মনের হৃদয়ের যে কল্পনার যে অনুরাগের যত সঙ্গতি তাহারাই তত শক্তিমান, তত ফলপ্রসূ আর যে সব জিনিষ ইহার সম্পর্ক বিরহিত বা ইহার পরিপন্থী তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে না। মানুষের স্থূল শরীরটিও এই প্রাণেরই বাহন, প্রাণের ধর্ম্মের

ফল বা পরিণতি, জাগ্রত মূর্ত্তি মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের প্রতিষ্ঠানাদিও গড়িয়া উঠিয়াছে সেই প্রাণেরই ধর্ম্ম অনুসারে মানুষের যে মৌলিক প্রকৃতি তাহারই চরিতার্থতার জন্য। সমাজ যে একটা বিশেষ রূপে বাঁধা পড়িয়াছে, মানুষ যে একটা বিশেষ ধরণে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে একটা বিশেষ প্রণালীতে আদান প্রদান চলিতেছে— এ সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে মানুষের, প্রকৃতির প্রাণ শক্তির প্রয়োজন বা দাবি অনুসারে।

সুতরাং পৃথিবীতে স্বর্গ বানাইব, সমাজকে নন্দনে আর মানুষকে নন্দনের পারিজাতে পরিণত করিব অথবা এই রকম আরও যে কত কত utopia বা স্বপ্নের রাজ্য মানুষের মনে ও চিত্তে খেলিয়া উঠিতেছে তাহা সত্য হইতে পারে, বাস্তব হইতে পারে একমাত্র তখনই যখন মানুষের প্রাণে তদনুযায়ী রূপান্তর ঘটিয়াছে বা ঘটাইতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহা কি কখন সম্ভব?

সমস্যার ব্যাসকূট প্রাণের রূপান্তর। কারণ, সকল রূপান্তরের, বিশেষতঃ স্থূল বাস্তব ভৌতিক রূপান্তরের, কেন্দ্র হইতেছে এই প্রাণশক্তি। প্রাণে একরকম গ্রন্থী পড়িয়াছে, তাই জগতের সমাজের মানুষের চেহারা এই রকম হইয়াছে; চেহারা আর-একরকম করিতে হইলে এই গ্রন্থী খুলিয়া আর রকম গ্রন্থী দিতে হইবে। কিন্তু প্রাণের ত যথা ইচ্ছা রূপ দেওয়া যাইতে পারে না, যেমনটি ভাল লাগে যেমনটি পছন্দ হয় তেমন করিয়া প্রাণকে ঢালাই করিতে পারি না— প্রাণ যে চলিয়াছে নিজের তোড়ে নিজের

জোরে; দু দিন হয়ত তাহাকে এখানে ওখানে বাধা দিয়া রাখিতে পারি, খাল কাটিয়া এদিক ওদিক করিয়া দিতে পারি, কিন্তু ভরা বর্ষার কীর্ত্তিনাশার মত সে একদিন সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া আপন পথ করিয়া লইয়া চলিবে, তাহার ত কোন সন্দেহই নাই।

তাই ত অনেক মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, অনেক ধর্ম্মও শিক্ষা দিয়াছে, জগতের সমস্ত মানুষের বা সমাজের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়, ইহজগতের নিয়ম অনুসারেই ইহজগৎ চিরকাল চলিবে। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে ব্যক্তিগত মুক্তি অর্থাৎ নিয়ম বদলানের চেষ্টা নয়, নিয়মের অতীত হইয়া চলিয়া যাওয়া। বহুর, রূপের, সম্বন্ধের খেলা যেখানে সেখানেই হইয়াছে প্রাণের, মায়ার, অবিদ্যার প্রতিষ্ঠা—এ সকলের শেষ ঐকান্তিক নিবৃত্তি যেখানে সেই শান্ত এক অদ্বৈত সত্তায় নির্ব্বাণ লাভ করাই মানুষের বিদ্যা-সিদ্ধি, পরম পুরুষার্থ। জগৎকে স্বর্গ বানান যায় না, যদি চাও স্বর্গে উঠিয়া যাইতে পার।

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য কোন উপায় নাই। কিন্তু আশার কথাও আছে। মানুষের মনে চিত্তে যে সব সোণার স্বপ্ন ফলিয়া উঠে, যুগে যুগে উঠিতেছে ও মানুষ বার বার বিফল হইয়াও চেষ্টা করিতেছে তাহাকে বাস্তব করিয়া তুলিতে—প্রাণের মধ্যে যদি ইহার কোনই শিকড় না থাকিবে, তবে তাহা আদৌ গজাইয়া উঠে কেন? মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা ঐ অসম্ভবের জন্যই ক্রমাগত চলিতে চাহিতেছে কেন? শুধু তাই নয়, এমন

মহাপুরুষও অনেক আছেন যাঁহাদের কণ্ঠে শুনিতে পাই সত্যের অটুট বারতা—

বেদাহমেতৎ পুরুষং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

যাঁহারা আপন সত্যদৃষ্টি সত্যস্থিতির উপর ভর করিয়া, নির্ভয়ে বলিতে পারিয়াছেন যে প্রাণের তামসরূপের পশ্চাতে আছে একটা দিব্যরূপ, এই তামসরূপকে সরাইয়া বাস্তব জীবনে সেই দিব্যরূপকে ফলাইয়া ধরা যায়; প্রাণের রূপান্তর দুঃসাধ্য—ক্ষুরস্য ধারাইব নিশিতা দুরত্যয়া—হইলেও, একান্ত অসাধ্য নয়।

প্রাণের রূপান্তর অসম্ভব বোধ হইয়াছে এইজন্য যে প্রাণকে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছি মনের ও চিত্ত বেগের ধারায়, বুদ্ধির ও নীতির নিয়ম প্রাণের উপর চাপাইতে চাহিয়াছি। কিন্তু আধারের, অন্তঃকরণের, এ পারের সকল স্তরের কেন্দ্র হইতেছে প্রাণশক্তি; এপারের কোন শক্তিই প্রাণ-শক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, নৈতিক বৃত্তিকে, ভাবুকতার বৃত্তিকে সমস্তই প্রাণময় পুরুষের ঈশ্বরত্ব আজ না হউক কাল স্বীকার করিতে হইবে - আজও স্বীকার করিতেছে তবে গৌণভাবে, ভিন্ন রকমে। প্রাণময় পুরুষের প্রভু কে, ঈশ্বর কে? কাহার নিকট এই অসুর আত্ম-বলিদান করিতে পারে? এমন কোন ধর্ম্ম আছে কি না, যাহার নিকট প্রাণের ধর্ম্ম হার মানে—এজন্য নয় যে সেখানে প্রাণ

বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না, কিন্তু এইজন্য যে প্রাণ সেখানে পায় গভীরতর প্রাণ, প্রাণের ধর্ম্ম সেখানে আরও একটা উদারতর ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া যায় ?

এক দিকে নিশ্চল ভেদাভেদ রহিত সত্তা—একং সৎ—অক্ষর ব্রহ্ম, ও আরএক দিকে এই চঞ্চল ভেদাত্মক প্রাণময় জগৎ। এই উভয়ের মাঝখানে আছে একটা সত্যের, শুধু সত্যের বা সৎএর প্রতিষ্ঠান নয়, সত্যের ও ঋতের অর্থাৎ সত্যধর্ম্মের, চিন্ময় শক্তির বৃহৎ লোক—ইহার নাম উপনিষদে দেওয়া হইয়াছে বিজ্ঞানময় লোক ; এখানেই আছে ধর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্মের প্রকৃত বিধান, প্রকৃতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। প্রাণময়পুরুষ মনোময় ও অন্নময় পুরুষকে লইয়া এই বিজ্ঞানময় পুরুষেরই একটা বিকৃত স্বভাব ফলাইতেছে ; প্রাণময় পুরুষ নিজের ধর্ম্ম অনুসারে চলিতেছে, অজ্ঞানের বশে আপন অন্তর্য্যামী বিজ্ঞানময় পুরুষকে অগ্রাহ্য করিয়া অস্বীকার করিয়াই যেন চলিতেছে, কিন্তু তবুও প্রভুর শক্তি সে অহরহ অনুভব করিতেছে। উপরের, ওপারের এই যে সত্য ধর্ম্ম তাহা প্রাণে পূর্ণ প্রকটিত হইতে পারে, প্রাণ যদি শান্ত হইয়া তাহাকে আসিতে পথ দেয়, তাহার ভঙ্গী অনুসারে চলিবার প্রণতি তাহার থাকে। এই অধ্যাত্ম-পুরুষের চিন্ময় তপোময় ধর্ম্মই একমাত্র প্রাণের ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত করিতে পারে, মানুষের মনকে চিত্তকে দেহকে একটা নূতন কাঠাম দিতে পারে, স্বভাবের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজের মূর্ত্তিও অন্য রকম করিয়া দিতে পারে। সমাজের স্থায়ী পরিবর্ত্তন, এই এক রূপান্তর ছাড়া

আর কোন পথে সম্ভব নহে। প্রাণকে আর কোন শক্তি দিয়া গড়িতে বা চালাইতে পারা যায় না।

আজ যে মনুষ্য সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, মানুষের প্রাণে মনে চিত্তে দেহে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই ঐ উপরের লোক হইতে অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের অবতরণের চাপ। মানুষের সমস্যা আজ তাই ইহাকে অভ্যর্থনা করিবার, ধারণ করিবার সাধনা।